ইকবাল কবীর মোহন

ছোটদের মহানবী {সা}

ইকবাল কবীর মোহন

ছোটদের মহানবী {সা}

ইকবাল কবীর মোহন

ছোটদের মহানবী {সা}

ছোটদের মহানবী (সা)

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায় : শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা
ফোন : ০১৭১০৩৩০৪৩০
প্রকাশকাল : জুন ২০১১
শব্দবিন্যাস : ডিজাইন বাজার
ছাপা : সফিক প্রেস, বাংলাবাজার।
প্রচ্ছদ : মুবাশ্বির মজুমদার
অলঙ্করণ : আজিজুর রহমান

মূল্য : ৮০ (আশি) টাকা মাত্র

Chotoder Mohanabi (SM)
Iqbal Kabir Mohon
Published by Shishu Kanon
Price : Taka 80.00 only
ISBN-984-8395-00-1
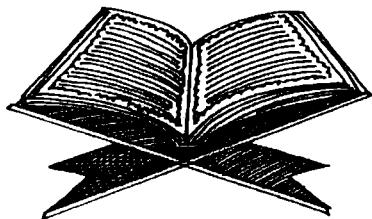
আল-কুরআনে মহানবী (সা)

১. আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ।-(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৯)

২. আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে পাঠ করে । তোমাদের পবিত্র করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয় ।-(সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৫১)

৩. তুমি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো ।-(সূরা নাহল, আয়াত : ১২৫)

৪. আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি ।-(সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১৫৭)

৫. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি । -(সূরা সাবা, আয়াত :২৮)

৬. আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন । হে বিশ্বাসীগণ! তোমারও নবীর জন্য প্রার্থনা করো এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন করো ।-(সূরা আহজাব, আয়াত : ৫৬)

লেখকের কথা

আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের জীবনব্যবস্থা। ইসলাম অর্থ মহান স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান। যে ঈমান আনে সে মুমিন। একজন মুসলিম যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে তা মূলত তিনটি–এক. তাওহিদ, দুই. রিসালাত, ও তিন. আখেরাত।

তাওহিদ মানে আল্লাহর একক সত্তা। যার অর্থ তিনি একাই সবকিছুর স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রক ও সংহারক। তাঁর কোনো শরিক নেই। মানুষকে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করতে হবে। রিসালাত বলতে বুঝায় আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর ওপর অর্পিত নির্দেশ ও বিধান। এই বিধান মানতে মানুষ বাধ্য। আখেরাত হলো দুনিয়ার পরের অনন্তজীবন। মানুষের ভালো ও মন্দের বিচার হবে সেখানে। এই বিচার করবেন মহান আল্লাহতাআলা। আর তার ভিত্তিতে মানুষ লাভ করবে জান্নাত ও জাহান্নাম।

ইসলাম ও ঈমানের এই মহান সত্যকে আমাদের সোনামণি শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া জরুরি। ছোটবেলা থেকে ঈমানসমৃদ্ধ প্রকৃত মানুষ হিসেবে এদের গড়ে তুলতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন ইসলামের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। 'ছোটদের মহানবী (সা)' বইটিতে এই মহামানবের জীবন ও কর্মের ওপর সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। এই বইটি মহান স্রষ্টা ও প্রিয় নবীর প্রতি বিশ্বাসের চেতনাকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

মহান আল্লাহপাক এই প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন।

ইকবাল কবীর মোহন

সূচি

ছোটদের মহানবী (সা)

দুনিয়ায় এলেন মহানবী (সা)

৫৭০ সাল। ২৯ আগস্ট। ১২ রবিউল আউয়াল। আরবের মক্কা নগরী। রত্নগর্ভা মা আমিনার পর্ণ কুটির। রাত পোহাবার আর বেশি দেরি নেই। সুবহে সাদিকের সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে।

সুবহে সাদিক মানে দিনও নয় রাতও নয়। এই সময় পর হলেই রাত শেষ হয়, শুরু হয় দিনের পথচলা। এক অপূর্ব সুন্দর সময় এটি। রাত-দিনের এই আবছা অন্ধকারে আলোর ফোয়ারা ছিটিয়ে দুনিয়ায় এলেন এক শিশু। বেশ ফুটফুটে। ফুলের মতো অনিন্দ্য সুন্দর। তিনি আর কে? আমাদের প্রিয়নবী দুনিয়ার সেরা মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

সেদিনকার সকাল ছিল সুন্দর ও ঝলমলে। মা আমিনার পর্ণ কুটিরের আশপাশে ফেরেশতারা এসে ভিড় করেছেন। পাখপাখালি মধুর সুরে গান

ধরেছে। সর্বত্র খুশির এক অনাবিল আমেজ। বাতাসে কানাকানি, গুঞ্জরণ। হলদে কাঁচা রোদের ঠোঁটে মনভোলা লাল হাসি। গোটা প্রকৃতিজুড়ে আনন্দের উতরোল। কেননা, দুনিয়ায় এসেছেন জগতের নবী, মানুষের সেরা মানুষ।

শিশুনবী (সা)-এর মায়ের নাম আমিনা। আর পিতার নাম আবদুল্লাহ। তিনি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ গোত্রের বড় নেতা মুত্তালিব। এই খ্যাতনামা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয়নবী, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আরবরা দু'জন নবীর বংশধর। একজন হযরত নূহ (আ)। অপরজন হযরত ইসমাঈল (সা)। ইসমাঈল (আ)-এর বংশের নাম কুরাইশ। কুরাইশ একটি সম্মানিত গোত্র। কাবাঘরের হেফাজতকারী তারা। এই গোত্রের নেতারা মক্কার প্রধান ব্যক্তি।
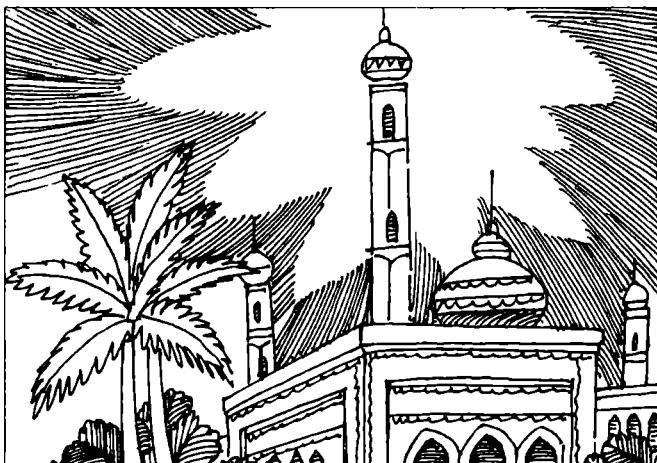
নবীজীর দাদা আবদুল মুত্তালিব তখন ছিলেন গোত্রের প্রধান। কুরাইশদের নেতা। আবদুল মুত্তালিবের বারোজন ছেলে। তার মধ্যে আবদুল্লাহ একজন। তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র, নম্র, দয়ালু ও বিনয়ী। তার সাথে বিয়ে হয় মা আমিনার। কিছুদিন পর আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ) আমিনার কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন : 'শোনেন আমিনা, আপনাকে এক শুভ সংবাদ দিচ্ছি। আপনার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হবে। তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ।'

ইসলামের নবীর জন্মের ছ'মাস আগের ঘটনা। আবদুল্লাহ ব্যবসার কাজে সিরিয়া গেলেন। ফিরে আসার পথে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আর সুস্থ হতে পারলেন না। মদীনায় ইন্তেকাল করলেন তিনি। ফলে নবীজীর মা আমিনা বিধবা হয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহর ইন্তেকালের ছয় মাস পরই আমাদের প্রিয়নবী জন্মগ্রহণ করলেন।

শিশুনবী মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের খবর শুনে দাদা আবদুল মুত্তালিব যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি দৌড়ে এলেন আমিনার কাছে। শিশুনবীকে কোলে নিয়ে দাদা ছুটে গেলেন কাবাঘরে। সেখানে গিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। নবজাতকের জন্য মনভরে দোয়া করলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব সাতদিনের দিন খুব ধুমধাম করে নাতির আকিকাহ্ দিলেন। তার খুশির যেন শেষ নেই। তিনি সমাজের লোকজন ডেকে ভালো করে খাওয়ালেন। নবজাতকের নাম রাখা হলো 'মুহাম্মদ'। 'মুহাম্মদ' মানে প্রশংসিত-প্রশংসার যোগ্য। এদিকে মা আদর করে পুত্রের নাম রাখলেন 'আহাম্মদ'।

বলতে পারো ?

১. মহানবী (সা) কখন দুনিয়ায় এলেন?

২. সেদিনকার সকালের পরিবেশ কেমন ছিল?

৩. মহানবী (সা)-এর মা, বাবা ও দাদার নাম কী?

৪. জিব্রাঈল (আ) মা আমিনাকে কী বললেন?

৫. আল্লাহর নবী (সা)-এর নাম কী রাখা হলো?

মহানবী (সা)-এর ছেলেবেলা

মা আমিনার এক দাসী ছিল। নাম সোয়ায়বা। তিনি কয়েকদিন শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে দুধ পান করালেন। আরবে তখন এক ধরনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। অভিজাত ঘরের শিশুদের সেবাযত্নের জন্য ধাত্রীর কাছে দেয়া হতো। শিশুনবীর জন্যও ধাত্রী ঠিক করা হলো। নাম তাঁর বিবি হালিমা। তিনিই ছিলেন মহানবী (সা)-এর দুধমা।

হালিমা ছিলেন খুবই গরিব। বেশ অভাব-অনটনে চলছিল তাঁর সংসার। কিন্তু শিশু মুহাম্মদ (সা) তাঁর সংসারে আসার পর হালিমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। তাঁদের রোগা ছাগলগুলো আগের চেয়ে বেশি দুধ দিতে লাগল। জীর্ণশীর্ণ খেজুর গাছগুলো মোটাতাজা হয়ে ওঠল। ফলে গাছে গাছে প্রচুর ফল এলো। এ কারণে সংসারের আয় উন্নতি বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে হালিমার ঘর আনন্দে ভরে উঠল। অল্পদিনের মধ্যেই হালিমার সংসারের অবস্থা বদলে গেল। তাই হালিমা শিশুটিকে পরম ভাগ্যবান মনে করলেন। এ জন্য খুব আদর-যত্ন দিয়ে তিনি শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে লালনপালন করতে লাগলেন।

হালিমার সংসারে থাকার সময় মহানবী (সা)-এর কাছে ফেরেশতা এলেন। জিব্রাঈল (আ) নূর দিয়ে তাঁর হৃদয় পূর্ণ করে দিলেন। শিশুনবী মুহাম্মদ (সা)-এর কথাবার্তা ও কাজকর্ম সবই ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। হালিমা এই শিশুটির মধ্যে এক অসাধারণ আচরণ দেখতে পেলেন। তাই তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এই শিশুতো মোটেও সাধারণ নয়। এ কারণে কেউ তাঁর অনিষ্ট করতে পারে। তাই তিনি শিশুনবীকে মা আমিনার কোলে ফিরিয়ে দিলেন। তখন মহানবী (সা)-এর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর।

বিবি হালিমার সীমাহীন আদর-যত্নে পালিত নবী (সা) আপন মায়ের কোল ফিরে পেয়ে তো মহাখুশী। মায়ের আঁচলে এখন প্রাণ জুড়ায় তাঁর। কিন্তু মায়ের অফুরন্ত আদর ও স্নেহ-ভালোবাসা নবী (সা)-এর ভাগ্যে বেশিদিন জুটল না। স্বামী আবদুল্লাহর মৃত্যুতে আমিনার মন এমনিতেই ভেঙে গিয়েছিল। চিন্তা ভাবনায় তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাই একবার তিনি মনস্থ করলেন, শিশু পুত্রকে নিয়ে স্বামীর কবর জিয়ারত করতে মদীনায় যাবেন। যেই পরিকল্পনা সেই কাজ। একদিন ঠিকই তাঁরা মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। এক দাসীকেও তিনি সাথে নিয়ে গেলেন। মক্কা থেকে মদীনা বহু দূরের পথ। সেই যুগে দূরের পথে যাতায়াত করা ছিল বেশ কষ্টকর। তাও কষ্ট করেই আমিনা শিশু মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে মদীনায় গেলেন।

মদীনায় বেশ ক'দিন কাটালেন তাঁরা। এরি মধ্যে মা আমিনা স্বামীর কবর জিয়ারত করলেন। কিন্তু ফিরে আসার পথে অসুস্থ হয়ে তিনিও মারা গেলেন। এতিম হয়ে পড়লেন ছোট্ট বালক মুহাম্মদ (সা)। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। এবার এতিম বালকের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়ল দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওপর। দাদা তাঁকে অসম্ভব আদর করেন। কোলে নেন, চুমু খান। মায়ের মৃত্যুর শোক ও মর্মপীড়া ভুলাবার চেষ্টা করেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁকে 'আহমদ' বলে ডাকতেন। কিন্তু দাদার আদরও মহানবী (সা)-এর বেশিদিন সইল না। বছরখানেক পর আবদুল মুত্তালিবও মারা গেলেন। এবার চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার নিলেন। আবু তালিবও কুরাইশ বংশের প্রভাবশালী লোক। তিনি নবীজীকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন খুবই শান্ত প্রকৃতির। মাঝে মাঝে তিনি চাচার মেষ চরাতেন। তখন খোলা প্রান্তরে নীল আকাশের নিচে বসে বসে কী যেন অবাক মনে ভাবতেন, আর আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। মহান আল্লাহর এই সুন্দর সৃষ্টি নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগত, কে তৈরি করল এই বিশাল নীলিম আকাশ? এই অজস্র মরু পর্বত? এই নয়নাভিরাম গাছগাছালি? পৃথিবীর এই অবাক সূর্য? সুন্দর পৃথিবী, চাঁদ, তারা এসব?

দিন গেল। মাস গেল। বালক নবী (সা) ধীরে ধীরে বড় হলেন। নবীর ভালো ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়। তাঁর কথা খুব সুন্দর। তাঁর চেহারা আরও বেশি সুন্দর। তাই সবার মন কাড়েন তিনি। বালক মুহাম্মদ (সা)-এর আচার-আচরণ, কথাবার্তা চাচা আবু তালিবের খুব পছন্দ হলো। আর পাঁচটি ছেলের মতো নন তিনি। বালকরা সবাই যখন হাসে খেলে কাটায়, হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ায়, মুহাম্মদ (সা) সেসব কাজ থেকে দূরে থাকেন। খেলতে খেলতে ছেলেরা যখন ঝগড়া করে, তখন তিনি এসে তা থামিয়ে দেন। সুযোগ পেলেই মহানবী (সা) মানুষের উপকার করেন। মানুষকে ভালো উপদেশ দেন।

মহানবী (সা)-এর বয়স যখন বারো তখন তিনি চাচার সাথে ব্যবসার কাজে একবার সিরিয়া গমন করেন। সেই বছর আবু তালিবের ব্যবসায় খুব ভালো লাভ হলো। চাচা তাই যারপরনাই খুশি হলেন। আবু তালিবের ধারনা বালক মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যই যেন এসেছে তাঁর এ সফলতা। তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর ওপর দারুণ খুশি হলেন। ফলে চাচার আদর-যত্ন আরও বেড়ে গেল। এভাবে মুহাম্মদ (সা) ক্রমেই বেড়ে উঠলেন।

বলতে পারো ?

১. আরবে তখন কী রেওয়াজ প্রচলিত ছিল? মুহাম্মদ (সা)-কে পালন-পালনের জন্য কার কাছে দেয়া হলো?
২. মুহাম্মদ (সা)-এর কারণে হালিমার পরিবারে কী পরিবর্তন এলো?
৩. মহানবী (সা)-এর মা ও বাবা কখন ইন্তেকাল করেন?
৪. বালক মুহাম্মদ (সা) মেষ চড়াতে গিয়ে একাকী কী ভাবতেন?

মুহাম্মদ (সা) হলেন আল-আমিন

মক্কার অধিকাংশ মানুষ ছিল খুব খারাপ। তারা মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানি করত। ঝগড়া ও খুন-খারাবি ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। তারা মদ খায়, মাতলামি করে। তাই কারও মনে শান্তি ছিল না। আরব সমাজে অহরহ অশান্তি লেগেই থাকত। এসব অনাচার ও অশান্তির কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষের এ অবস্থা দেখে মনে খুব কষ্ট পান। তিনি ভাবেন–কিভাবে সমাজের এসব অসঙ্গতি ও দুর্দশা দূর করা যায়? কিভাবে পথহারা খারাপ মানুষগুলোকে ভালো করা যায়? আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) অবশেষে ঠিক করলেন, সবাই মিলে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ জন্য তিনি যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করে ভালো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি জানতেন যুবকরাই হলো আসল শক্তি। তিনি যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন 'হলফুল ফুজুল' নামে এক সংগঠন। সংঘের কী কাজ হবে তাও ঠিক করা হলো। সংঘ যেসব কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলো,

তা ছিল, ক. যারা অনাথ-অসহায় সকলে মিলে তাদের সেবা করবে, খ. যারা জুলুম করবে সকলে মিলে তাদের বাধা দেবে, গ. যার ওপর জুলুম করা হয়েছে সকলে মিলে তাকে সাহায্য করবে, ঘ. কেউ ঝগড়া-বিবাদ করবে না, ঙ. সবাই মিলেমিশে থাকবে।

মহানবী (সা)-এর এ অসাধারণ কাজ অনেকের দৃষ্টি কাড়ল। আরবের সবাই দেখল, বালক মুহাম্মদ (সা) ভালো ভালো কথা বলেন, ভালো কাজ করেন। তিনি অন্যকেও ভালো কথা বলতে ও ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। মহানবী (সা) কখনও খারাপ কাজ করেন না। কাউকে গালমন্দ করেন না। কারও মনে কষ্ট দেন না। তিনি মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা তিনি অপছন্দ করেন। মক্কার সবাই অবাক হলো তাঁর ব্যবহারে, তাঁর কথা ও কাজে। তারা আরও লক্ষ করল, মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে কোনো জিনিস আমানত রাখলে তা তিনি ঠিকমত ফেরত দেন। কাউকে ওয়াদা দিলে তা অবশ্যই পূরণ করেন। কথা ও কাজে তিনি এতটুকুও এদিক-সেদিক করেন না।

বালক মুহাম্মদ (সা)-এর এই আচরণে সবাই দারুন খুশি, সবাই খুব আনন্দিত। মক্কার সকলে তাই তাঁর নাম দিলো 'আল-আমিন'। 'আল-আমিন' অর্থ বিশ্বাসী। ফলে অতি দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বাসী মুহাম্মদ (সা)-এর নাম।

বলতে পারো ?

১. তখন আরবের অবস্থা কেমন ছিল?

২. আরবের পরিবেশ দেখে মহানবী (সা) কী ভাবতেন?

৩. সমাজ থেকে খারাবি দূর করতে মহানবী (সা) কী গঠন করলেন?

৪. মহানবী (সা)-এর আচার ব্যবহার কেমন ছিল?

৫. লোকেরা কেন তাঁকে আল-আমিন বলে ডাকত? আল-আমিন অর্থ কী?

খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ে হলো

আরবের মক্কায় তখন বাস করতেন এক বিধবা মহিলা। নাম তাঁর খাদিজা। অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন তিনি। সবাই তাঁকে খুব ভালো মানুষ হিসেবে জানত। খাদিজার অনেক বড় ব্যবসা ছিল। অথচ অত বড় ব্যবসা দেখাশোনা করার মতো যোগ্য লোক তাঁর ছিল না। তিনি একবার শুনলেন মুহাম্মদ (সা)-এর কথা, তাঁর সততা ও আমানতদারির কথা। তাই তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে ডেকে পাঠালেন। হযরত খাদিজা মহানবী (সা)-কে তাঁর ব্যবসায় পরিচালনা করার দায়িত্ব নেয়ার জন্য প্রস্তাব রাখলেন।

নবী মুহাম্মদ (সা) খাদিজার প্রস্তাবে রাজি হলেন। ব্যবসায় নেমে তাঁর বেশ নাম হলো। খাদিজার কারবারে লেনদেন ও বেচাকেনা বেড়ে গেল। ফলে ব্যবসায় খুব লাভও হলো। নবী (সা) ব্যবসায় পুঁজিসমেত মুনাফা খাদিজাকে সময়মতো বুঝিয়ে দিলেন। হযরত খাদিজা দেখলেন তাঁর সবকিছু ঠিকঠাকই চলছে। কোথাও কোনো গরমিল নেই। এতে খাদিজা খুব খুশি হলেন। মুহাম্মদ (সা)-এর সততা দেখে তিনি অবাকও হলেন।

মহানবী (সা)-এর ব্যবহার ও অনুপম চরিত্রমাধুর্য খাদিজকে মুগ্ধ করল। তাই খাদিজা তাঁকে বিয়ে করার এক প্রস্তাব আবু তালিবের কাছে পাঠালেন। আবু তালিব নবী (সা)-এর মুরুব্বি। সব শুনে আবু তালিব ভাতিজার বিয়েতে মত দিলেন।

মহানবী (সা)-এর বয়স তখন ২৫ বছর। আর খাদিজার বয়স ৪০ বছর। বিয়ের পর খাদিজা (রা) তাঁর সব সম্পদ তুলে দিলেন মহানবী (সা)-এর হাতে। তবে ধন-সম্পদের প্রতি মহানবী (সা)-এর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি ভাবেন মানুষের কথা, গরিব এতিম ও অসহায় লোকের কথা। তাই নবীজি সব সম্পদ গরিব-দুঃখী ও এতিমের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। আল্লাহর নবী (সা) তো মহামানব! দুনিয়ার কোনো সম্পদের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। তিনি ভাবেন অন্য কিছু। ভাবেন তাঁর স্রষ্টা-মালিকের কথা। মানুষকে নিয়েই তাঁর যত দুশ্চিন্তা। মানুষকে কিভাবে ভালো করা যায়, কিভাবে তাদের চরিত্র পাল্টানো যায়, তা নিয়েই সর্বদা ভাবেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)।

মহানবী (সা) মানুষের উপকার ছাড়া কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারেন না। কারও ওপর জুলুম হয়েছে দেখলে তিনি প্রতিবাদ করেন। নবীজী

বলেন : 'মদ খেয়ো না।' নবীজী আরও বলেন : 'গরিবের সাহায্য করো। মা-বাবার কথা মান্য করো।'

এমন আরও কত ভালো ভালো কথা বলেন মহানবী (সা)। তিনি বলেন : 'মাপে কম দিও না। কথা দিলে কথা রাখ। ওয়াদা ভঙ্গ করো না। আমানতের খেয়ানত করো না।'

হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে বিয়ের পর এভাবেই সত্যের পথে সময় ব্যয় করতে লাগলেন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)।

ব ল তে পা রো ?

১. হযরত খাদিজা (রা) কে ছিলেন? তিনি কেমন মহিলা ছিলেন?

২. খাদিজা (রা) তাঁর ব্যবসা দেখাশুনার ভার কাকে দিলেন?

৩. মুহাম্মদ (সা) ব্যবসায় কেমন করলেন?

৪. বিয়ের পর খাদিজা (রা) তাঁর ধন-সম্পদ কী করলেন?

হাজরে আসওয়াদ নিয়ে বিরোধ

মহানবী (সা)-এর কথাবার্তা, আচার-আচরণে সবাই মুগ্ধ হয়। তাই লোকেরা তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আরবের অনেক বিবেকবান লোক নবীকে আপন বলে ভাবতে থাকে। তাঁর কথায় লোকেরা উঠে বসে।

এমন সময় ঘটল এক ঘটনা। কাবাশরীফ ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছিল। এতে বসানো ছিল বহুদিন আগের একটা কালো পাথর। পাথরটির নাম হাজরে আসওয়াদ। এ পাথর ছিল সকলের কাছে খুব প্রিয়। অনেকে এ পাথরকে জীবনের চেয়েও দামি মনে করত। কাবাঘর তৈরির সময় এই পাথরকে একটা আলাদা জায়গায় রাখা হয়েছিল। ইতোমধ্যে কাবাঘর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। এখন কালো পাথরকে কাবার দেয়ালে স্থাপন করা দরকার। কালো পাথর এককভাবে স্থাপন করার জন্য প্রতিটি গোত্র প্রতিযোগিতা শুরু করল। ফলে গোত্রে গোত্রে বেধে গেল গোলযোগ।
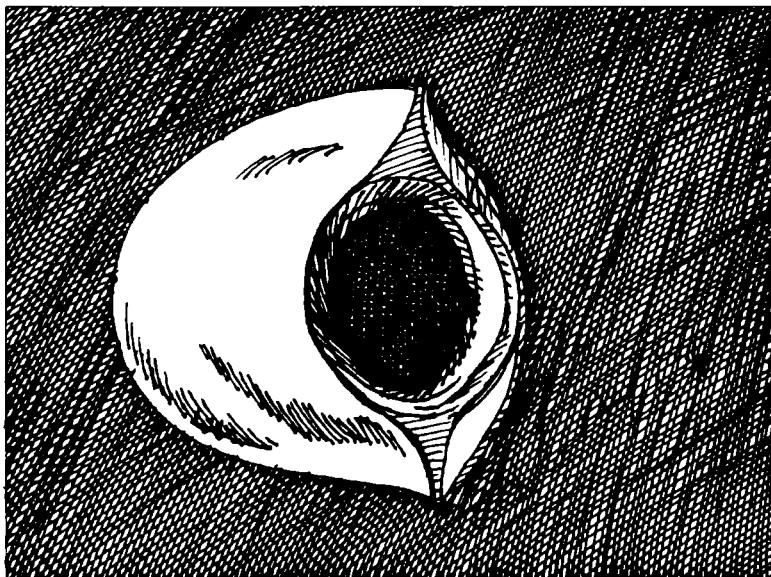
ভালোবাসার এই পাথরকে বসাতে এই দল বলে আমরা নিয়ে যাব, অপর দল বলে পাথর আমরা নিয়ে বসাব। সকল দলই পাথর বসিয়ে নিজ নিজ কৃতিত্ব নিতে দাবি জানাল। কেউ কারও দাবি ছাড়তে রাজি হলো না। শেষে হলো কথা কাটাকাটি। তারপর হলো ঝগড়া। শেষমেশ এমন হলো যে, সবাই তরবারি খুলে দাঁড়িয়ে গেল। যতক্ষণ না একটা দল জিতছে, এই মারামারির যেন শেষ নেই। এক সময় পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করল।

ঠিক সেই সময় দু'হাত ওপরে তুলে ঝগড়া থামিয়ে দিলো আবু উমাইয়া। উমাইয়া বলল, 'দেখ! মারামারি করে কোনো লাভ নেই। এতে মিছামিছি অনেকে মারা যাবে। তোমরাই মরবে। যে মরবে সে আর ফিরে আসবে না। তা হলে লাভ কী বলো? তার চেয়ে বরং তোমরা থাম। আমি বলি কি, কাল ভোরে যে কাবাঘরে প্রথম আসবে, সে ঝগড়ার বিচার করুক। সে যা বলবে, যাকে এই পাথর তুলে কাবায় বসাতে বলবে, আমরা সবাই তার পরামর্শ মেনে নেব।'

আবু উমাইয়ার কথা সবার পছন্দ হলো। তার কথায় সবাই রাজি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে মারামারি থামিয়ে তরবারি খাপে তুলে রাখল। তারপর বসে থাকল ভোরে কে প্রথম কাবায় আসে তার আশায়। ভোর হয় হয়। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার কেটে যাচ্ছে। পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে। এমন সময় সবাই আগন্তুকের পথের দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে আছে। কে আসবে? কোন সে পথিক?-এ জল্পনা-কল্পনার যেন শেষ নেই। এমন সময় কেউ একজনকে তাদের চোখে পড়ল। এ সময় লোকেরা একসাথে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল–হাজা, আল-আমিন! এই তো আমাদের আল-আমিন!'

মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনে সবাই খুশিতে চিৎকার করে উঠল। সবাই সমস্বরে বলল, 'ইনি যা বলবেন আমরা তা মেনে নেব। তার সবকথা মাথা পেতে নেব।' সবকিছু শুনলেন মহানবী (সা)। তাঁর ঘাড়ে চেপেছে বিশাল দায়িত্ব। গোত্রে গোত্রে বিরোধ। খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এ বিরোধ মিটানো। তাই একটু সময় নিয়ে মহানবী (সা) কী যেন ভাবলেন। তারপর একটা চাদর হাতে তুলে নিলেন। সেটা বিছিয়ে দিলেন মাটিতে। তারপর কালো পাথরটা হাতে তুলে বসিয়ে দিলেন চাদরের মাঝখানে। শেষে চার দলের চারজন নেতাকে চাদরের চারকোণ ধরতে বললেন।

শেষমেশ পাথরটাকে ধরে নিয়ে আসা হলো কাবায়। এরপর চাদর থেকে পাথরটা নিজে হাতে তুলে ঠিক জায়গায় স্থাপন করলেন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা)। এভাবে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর অসাধারণ সিদ্ধান্তের জন্য ভয়ানক একটা মারামারির হাত থেকে রেহাই পেল মক্কার মানুষ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এ ধরনের বিচার-বিবেকের কথা মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।

বলতে পারো ?

১. হাজরে আসওয়াদ কী?

২. হাজরে আসওয়াদ নিয়ে কী ধরনের সমস্যা তৈরি হলো?

৩. হাজরে আসওয়াদ নিয়ে বিরোধ শেষমেশ কোথায় গিয়ে গড়াল?

৪. বিরোধ মীমাংসায় কী প্রস্তাব করা হলো?

৫. মহানবী (সা) কিভাবে সমস্যার সমাধান করলেন?

হযরত মুহাম্মদ (সা) নবুয়ত পেলেন

দেখতে দেখতে চারদিকে নবীজীর নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। মক্কার অলিতে-গলিতে তাঁর সততা, ভদ্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও চরিত্রমাধুর্যের গুণগান শোনো যাচ্ছিল। অথচ এটা নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর কোনো ভাবনা নেই, বরং তাঁর ভাবনা বেড়ে চলছে অন্য কারণে।

মহানবী (সা) দেখলেন মক্কার অধিকাংশ মানুষ খারাপ। তারা ঝগড়াঝাটি করে। খুনখারাবি করে। পুতুলের পূজা করে। এগুলোর কোনটাই মুহাম্মদ (সা)-এর ভালো লাগে না। তাই তিনি খোঁজেন শান্তির পথ। খুঁজে বেড়ান শান্তি ও সুখের আসল মালিককে। এ জন্য নিরালায় একাকী বসে বসে তিনি ভাবেন। মুহাম্মদ (সা) স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। এভাবে দিন চলে যায়। মাস যায়। যায় বছর।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা) সঠিক পথের খোঁজে হয়রান হয়ে যায়। এমনি করে কেটে যায় পনেরটি বছর। অবশেষে আলোর সন্ধান পান তিনি।

এক গভীর রাত। হেরা পাহাড়ের গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন আছেন নবী মুহাম্মদ (সা)। চারদিকে গাঢ় কালো আঁধার। গভীর নীরবতায় ডুবে আছে গোটা জগৎ। এমন সময় হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল ঘন নীল আকাশ। হেরা পাহাড়ও আলোর জোয়ারে চমকে উঠল। পাহাড়জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আলোর ঝলকানি, নূরের রোশনাই। সেই থেকে হেরা পাহাড়ের নাম হয়েছে 'জাবালে নূর'—নূরের পাহাড়।

হেরা পাহাড়ের চারদিক ঝলমল আলোয় উদ্ভাসিত। সেই আলো ভেদ করে বেরিয়ে এলেন আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)। তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে এলেন। এটাই ছিল প্রথম ওহি। সত্যের আবেশে ধন্য হলেন মহানবী (সা)। এ সত্যের আলো ছিল ঈমানের আলো, ইসলামের আলো। এটাই ছিল মহানবী (সা)-এর সেই আলোচিত নবুয়ত। ওহি পেয়ে নবীজী বাড়ি ফিরে এলেন। সেই আশ্চর্য আলোর কথা খুলে বললেন স্ত্রী খাদিজাকে। খাদিজা (রা) স্বামীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি আল্লাহর বাণী বিশ্বাস করে মুসলমান হলেন। তারপর ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হলেন হযরত আলী (রা), হযরত জায়েদ (রা), হযরত আবু বকর (রা)। এভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল মুসলমানের সংখ্যা।

■ বলতে পারো?

১. আরবের দুরবস্থা দেখে নবী (সা) কিসের খোঁজে পেরেশান হলেন?

২. শান্তি ও সত্যের খোঁজে নবী (সা) কোথায় গিয়ে ধ্যানমগ্ন থাকতেন?

৩. একদিন হেরা পাহাড়ে কী ঘটল?

৪. মহানবী (সা) কিভাবে নবুয়ত পেলেন?

৫. মহানবী (সা)-এর সত্যের বাণী প্রথমে কারা গ্রহণ করেছিল?

শুরু হলো ইসলাম প্রচার

আল্লাহর বাণী নবুয়ত পেয়ে নবীজী বদলে গেলেন। তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। দীন প্রচারের কাজে নেমে পড়লেন নবীজী। তিনি চলে গেলেন শহরে। সেখানে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত লোকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'আল্লাহ এক। তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। তিনি আকাশ তৈরি করেছেন। জমিন বানিয়েছেন। চাঁদ-সুরুজ তৈরি করেছেন। গাছগাছালি, লতাপাতা, ফুল ও ফল সবকিছু তিনি বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা মূর্তি পূজা করো না। সব ছেড়ে কেবল এক আল্লাহর উপাসনা করো।'

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর এসব কথা শুনে শহরের লোকেরা ভীষণ রেগে গেল। তারা বলল, 'এতদিন আমরা যাদের পূজা করে আসছি আজ তারা সবাই মিছে হয়ে গেল! এটা হতে পারে না। আমাদের বাপ-দাদারা কী বোকা ছিল? মুহাম্মদের ঠিক মাথা খারাপ হয়েছে। ও পাগল হয়ে গেছে। নইলে এমন কথা বলে কী করে?'

মহানবী (সা)-এর কথা পথহারা মানুষের পছন্দ হলো না। তাই লোকেরা তাঁর কথা শুনতে চাইল না। তাতে কী? এতে নবীজী মোটেও দমলেন না। নতুন করে তিনি সকলের কাছে গেলেন। গিয়ে কাতর গলায় বললেন, 'আমার কথা শোন। আমি তোমাদের ভালোর জন্য বলছি। আমি তোমাদের ভালো চাই। তোমরা ঝগড়া করো না। মারামারি করো না। জুলুম করো না। মদ ছাড়। সুদ খোয়ো না। আর মূর্তি পূজা ছাড়। ভেবে দেখ, মাটির গড়া পুতুল মানুষের ভালো করতে পারে না, খারাপও করতে পারে না। সবই পারেন কেবল এক আল্লাহ। তাই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।'

এসব কথা শুনার পর মক্কার লোকেরা আবারও খুব ক্ষেপে গেল। রেগে গিয়ে তারা নবী (সা)-কে গালাগাল দিলো। তাঁকে অনেক মন্দ কথা বলল। এতে মুসলমানরাও ক্ষেপে গেলেন। শেষে দু'দলে মারামারি বাধার মতো অবস্থা হলো। মহানবী (সা) নিজের লোকদের কাছে ডাকলেন। ডেকে বললেন, 'সবর করো। ধৈর্যধারণ করো। সবরকারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন।' মুসলমানরা মহানবী (সা)-এর কথা মান্য করলেন। তারা ধৈর্যধারণ করলেন। মক্কার লোকেরা দেখল, মুহাম্মদ (সা)-কে গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। এবার তারা তাঁকে অভিশাপ দিতে শুরু করল। তারা নবীজীকে বলল, মুজাম্মাম! তার মানে তোমার মুখ কালো হোক। তুমি শেষ হয়ে যাও।

এবার মুসলমানরা আর থেমে থাকতে চাইলেন না। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাদের আবার ডাকলেন। বললেন, 'কেন রাগ করছ তোমরা! ওরা তো আমাকে গালি দেয়নি। ওরা গালাগালি করছে মুজাম্মাম নামে একটা লোককে। তাতে তোমাদের কী? আমার নাম তো মুহাম্মদ।' এভাবে ঝড়-ঝাপটা ও বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজ এগিয়ে চলল।

বলতে পারো?

১. নবুয়ত পেয়ে মহানবী (সা) মানুষকে কী কথা বললেন?

২. মহানবী (সা)-এর কথা শুনে লোকেরা কী করল?

৩. মহানবী (সা) লোকদের কাছে ফের কী কথা বললেন?

শে'আবে আবু তালিবে আশ্রয় গ্রহণ

মক্কায় মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকল। মুসলমানের সংখ্যা যত বাড়ল মক্কায় কুরাইশ কাফেররা ততই বিচলিত হতে লাগল। তাদের মনোভাব কঠোর হয়ে উঠল। তারা নও-মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য, তারা যেন মহানবী (সা)-এর ধর্ম ত্যাগ করে।

কুরাইশদের এক বড় নেতার নাম আবু জাহেল। সে ভাবল, মুহাম্মদ (সা) হাশেমি বংশের লোক। তাই তাঁকে কিছু বলা যাবে না। এতে সবার মাঝে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কাফেররা এবার অন্য নেতাদের ডেকে বৈঠক করল। কী করা যায়? সবাই মিলে আলোচনা করল। ঠিক করা হলো, মুসলমান আর হাশেমি বংশের লোকদের সাথে তারা যোগাযোগ রাখবে না। তাদের কোনো খাবার জিনিস তারা দেবে না। কেউ খাবার দিলে বাধা দেবে। তাদের হাট-বাজারে যেতে দেবে না। এক কথায় কোনো কিছুই

মুসলমানদের দেয়া হবে না, যাকে বলে বয়কট। তবে তাদের জন্য শর্ত জুড়ে দেয়া হলো। তারা বলল, মুহাম্মদ (সা)-কে তাদের হাতে তুলে দিলে হাশেমি বংশের লোকেরা সবই পাবে। তাদেরকে কেউ বাধা দেবে না। তারা নিরাপদে থাকতে পারবে।

কাফেরদের সিদ্ধান্ত এমনও ছিল যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-কে সুযোগে পেলেই খুন করবে। মক্কার এসব কাফেররা তাদের সিদ্ধান্তের কথা একটা কাগজে লিখল। তার নিচে সবাই সই-স্বাক্ষর করল। তারপর ঐ কাগজটা কাবার দেয়ালে টাঙ্গিয়ে দিলো। লোকেরা যাতে কাফেরদের সিদ্ধান্ত দেখতে পায় তার জন্যই এ কৌশল নেয়া হলো।

কাফেরদের এই সিদ্ধান্তের খবর আবু তালিবের কানে গেল। আবু তালিব নবীজীর চাচা। খবর পেয়ে তিনি তাঁর বংশের সবাইকে একত্র করলেন। সবার সাথে কথা বললেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, যত বিপদই আসুক না কেন তারা মুহাম্মদ (সা)-কে কুরাইশ কাফেরদের হাতে তুলে দেবেন না।
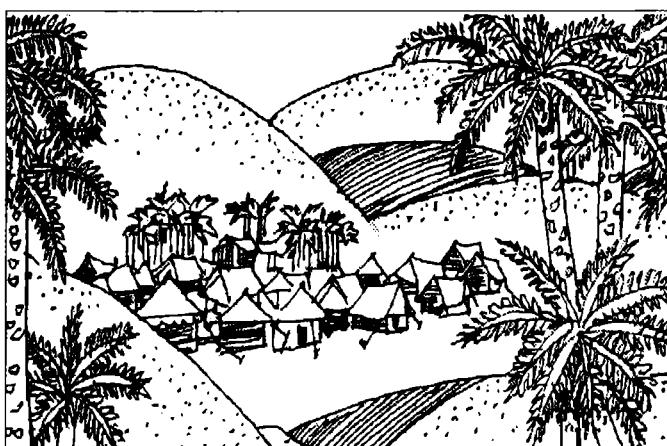
এদিকে শহরে থাকলে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। না খেয়ে মরতে হবে। কুরাইশরা যে তাদের বয়কট করেছে। তাই তারা অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করার চিন্তা করলেন। সবাই মিলে ঠিক করলেন, তারা মক্কা শহর ছেড়ে দেবেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা জায়গা ছিল আবু তালিবের। জায়গাটাকে বলা হয় 'শে'আবে আবু তালিব'। সকলে মিলে সেখানটাতেই

আপাতত তাঁবু স্থাপন করলেন। সেখানেই থেকে গেলেন তারা। দিন মাস কেটে বছর হয়ে গেল। শে'আবে আবু তালিবে কাটছে হাশেমি বংশের লোকদের জীবন। কিন্তু এবার তাদের ওপর সত্যিকার বিপদ নেমে এলো। তাদের সাথে খারার-দাবার যা ছিল তা ফুরিয়ে গেল। পান করার মতো পানি পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল। কুরাইশরা কোনো কিছুই পৌঁছাতে দিলো না শে'আবে আবু তালিবে। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খাবারের তাড়নায় কাঁদতে লাগল। ছোট ছোট ছেলে কাঁদে. মেয়েরা কাঁদে। বয়স্ক লোকেরাও অস্থির। লোকদের এই করুণ অবস্থা মক্কার লোকদের কানে গিয়ে পৌঁছল।

মহানবী (সা)-এর পরিবারের এই দুর্দশার জন্য মক্কার অনেকের খুব করুণা হলো। আবু জাহেলের জুলুম তারা আর মানতে চাইল না। তাদেরও লোকবল কম ছিল না। তারা তাই চাপ সৃষ্টি করল। অবশেষে আবু জাহেল মানুষের চাপের কাছে নতি স্বীকার করল। লোকজন দল বেঁধে ছুটল শে'আবে আবু তালিবে। তারা মহানবী (সা) ও অন্য সবাইকে সঙ্গে করে মক্কায় ফিরে এলো। ফলে সবাই নিজ নিজ বাড়িতে ঠাঁই করে নিলো।

আপাতত তাদের দুঃখের দিন শেষ হলো।

ব ল তে পা রো ?

১. কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিলো?

২. মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য কী শর্ত দেয়া হলো?

৩. কাবাশরীফে কী টাঙ্গিয়ে দেয়া হলো?

৪. মুহাম্মদ (সা) ও অন্যান্য মুসলমানরা কোথায় আশ্রয় নিলেন?

৫. শে'আবে আবু তালিবে আশ্রয়কারীদের অবস্থা কী হলো?

৬. অবশেষে মহানবী (সা) ও অন্যদের অবস্থা কী দাঁড়াল?

নির্যাতন বেড়ে চলল

শত নিপীড়ন চালিয়েও মক্কার কাফেররা থামল না। তারা মহানবী (সা)-কে আবারও বিব্রত করা শুরু করল। একদিন কাবাঘরের সামনে মহানবী (সা)-কে অপমান করা হলো। কাফেররা তাঁকে মারার জন্য তৈরি হলো। তখন সেখানে হাজির ছিলেন এক টগবগে তরুন। তিনি এসে রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, 'খবরদার! কেউ হাত তুলবে না মুহাম্মদের ওপর।'

আর যায় কোথায়! এবার কাফেরদের সব রাগ গিয়ে পড়ল সেই যুবকের ওপর। উপস্থিত সবাই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁর নাম হারেস। শত্রুরা মারতে মারতে তাঁকে ভীষণভাবে জখম করল। মারের চোটে হযরত হারেস (রা) মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। অবিরাম রক্তক্ষরণে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। এক সময় সকলের সামনেই অসহায়ভাবে মারা গেলেন হযরত হারেস (রা)। তিনিই হলেন ইসলামের পয়লা শহীদ।

হযরত হারেসকে এভাবে নির্মমভাবে খুন করায় মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হলেন। তাই তাঁরা এর প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হলেন। নতুন করে জেগে উঠলেন সবাই। ওদিকে শত্রুরাও প্রস্তুতি নিতে থাকল। শত্রুদের তিনজন বড় নেতা হলো আবু জাহেল, আবু লাহাব আর আবু সুফিয়ান। এরাও ভাবতে শুরু করল, কী করা যায়? ভেবেচিন্তে তারা ঠিক করল, মুসলমানদের আরও শায়েস্তা করতে হবে।

ফলে মুসলমানদের ওপর জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। সেদিনের অসহনীয় জুলুমের কথা মনে করলে আজও গা শিউরে ওঠে। চোখে পানি ধরে রাখা যায় না। পশু না হলে মানুষের ওপর এমন জুলুম কেউ করতে পারে না। মক্কার এক বড় কাফের উমাইয়া। তার এক দাস ছিল। নাম বেলাল। তিনি ভেতরে ভেতরে ঈমান এনে মুসলমান হলেন। মনিব উমাইয়া একথা জানতে পারল এক সময়। তারপর শুরু হলো নির্যাতন। এক সময় হযরত বেলালের হাতেপায়ে দড়ি বাঁধা হলো। গলায়ও দড়ি বাঁধা হলো। ঠিক যেমন মানুষ পশুকে বাঁধে। তারপর বেলালকে তুলে দিলো মক্কার খারাপ ছেলেদের হাতে। দুষ্ট বালকের দল তাঁকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে এলো। কেউ টানে সামনের দিকে, কেউবা টানে পেছনের দিকে। কখনও তাঁকে দৌঁড়ানো হয়। কখনও টেনে তুলে দাঁড় করায়। একদল হয়রান হলে নতুন দল আসে। তারাও দড়ি ধরে টানে। গালাগাল দেয়। পাথর মারে। এতে হযরত বেলালের শরীর কেটে টাটকা খুন বের হয়। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা হাসে, মজা করে। আবার মারে বেলালকে। এভাবে বেলালকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা চলে। ঠিক পশুর সাথে যেমন খেলা করে বর্বর মানুষ।

সাঁঝের বেলা আধমরা অবস্থায় বেলালকে ছেলেরা উমাইয়ার কাছে ফেরত দেয়। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নেই। অত্যাচারের চোটে হযরত বেলাল বসতে পারেন না। ঘাড় দুমড়েমুচড়ে যেন পড়ে যান। আধমরা বেলালকে আবার ঘরের মধ্যে নিয়ে আটকে রাখে উমাইয়া। তারপর চাবুক চালায় বুকে-পিঠে-মুখে। চাবুকের সঙ্গে চামড়া কেটে ওঠে আসে। ঝরঝর করে খুন ঝরে পড়ে সারা গা বেয়ে। তবু উমাইয়া চাবুক চালায়। চালাতে চালাতে বলে, 'বল এখন ইসলাম ছাড়বি কি না?'

কাঁদতে কাঁদতে হেসে ওঠেন হযরত বেলাল (রা)। তিনি নির্ভয়ে বলে ওঠেন, 'আহাদুন, আহাদুন, আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।' তিনি তাঁর মনিবকে

আরও বলেন, 'আমার জীবন আমার ইসলাম এক হয়ে গেছে উমাইয়া। মেরে তুমি তা আলাদা করতে পারবে না।'

এ কথা শুনে উমাইয়া আরও ক্ষিপ্ত হয়। তারপর বেলালকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে যায় মরুভূমিতে। মরুভূমিতে গরম বালুর ওপর বেলালকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। চোখ দু'টো রোদের দিকে। পিঠ বালুতে। এরপর বুকের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় ভারি পাথর। এত বড় পাথর যে চারজনে টেনে তুলতেও কষ্ট হয়। বুক ভেঙে যায় হযরত বেলালের। গরমে পিঠ পুড়ে যায়। পাশ ফেরা যায় না। এসব জুলুম বেলাল সহ্য করতে পারেন না। তাই তিনি জ্ঞান হারান। সকলে ভাবে বেলাল মরে গেছেন। বিকেলে সেই আধমরা বেলালকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরে আনা হয়। তাঁর ওপর আবার চাবুক মারে নিষ্ঠুর উমাইয়া। আর বলে, 'ইসলাম ছাড়বি কি না বল?'

উমাইয়ার কথা শুনে আধমরা বেলাল হেসে ওঠেন। বলেন, 'আল্লাহ এক, 'আল্লাহ এক। তুমি কিসের ভয় দেখাও উমাইয়া, জীবনের? জীবন দিয়ে দিলাম। তবুও ইসলাম ছাড়ব না। এটাই আমার জীবন। এটাই আমার সব।' একদিন এমনি করে চাবুক মারছিল বেলালের মনিব উমাইয়া। বেলালকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল মরুর তপ্ত বালুর ওপর। এক সময় সেই

পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)। কাতরানি শুনে থেমে গেলেন তিনি। তারপর এগিয়ে এলেন উমাইয়ার কাছে। শেষে অর্থের বিনিময়ে শয়তান উমাইয়ার হাত থেকে বেলালকে কিনে নিলেন তিনি। কিনে তাঁকে আজাদ করে দিলেন। উমাইয়ার জুলুম থেকে রেহাই পেলেন হযরত বেলাল (রা)। এসব কথা নবীজীর কানে ওঠে। তিনি শোনেন আর নীরবে কাঁদেন। আর লোকদের বলেন, 'সবর করো। ভয় নেই। আল্লাহ আছেন। সবকিছু দেখছেন তিনি'।

আরেক পরিবারের ওপরও এরূপ নিষ্ঠুর জুলুম চালিয়েছিল কাফেররা। সেই পরিবারে ছিলেন তিনজন লোক। বাবা ইয়াসের (রা)। মা সুমাইয়া (রা)। আর ছেলে আম্মার (রা)। তিনজনই ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন।

হযরত আম্মারের ওপর ভীষণ জুলুম করা হয়। চাবুক মেরে মেরে তাঁকে শুইয়ে ফেলা হতো। তাতেও চাবুক থামত না। তিনি কাঁদতেন। শেষে তাঁর মুখ থেকে আর কোনো আওয়াজ বের হতো না। নিঃসাড় হয়ে যেত তাঁর সারা শরীর। সেভাবেই তিনি বালুর ওপর পড়ে থাকতেন। চেতনা ফিরলে বলা হতো, 'ইসলাম ছাড়।'

মরণের সামনে দাঁড়িয়ে কী মধুর হাসিই না ফুঠে উঠত হযরত আম্মারের মুখে! তিনি বলতেন, 'আল্লাহ এক। আমি আল্লাহকে ভালোবাসি। আমি জীবনের পরোয়া করি না।'

হযরত ইয়াসেরকে বলা হলো, 'ইসলাম ছাড়'। তিনি শয়তানদের ওসব কথা কানেই তুললেন না। তখন শয়তানরা ইয়াসেরের দু'পায়ে ভালো করে দড়ি বাঁধল। সেই দড়ি টেনে বাঁধল দু'টি উটের গলায়। তারপর উট দু'টিকে দু'দিকে দৌড়ানো হলো।

বলবান উট। উট দু'টো ছুটে বেরিয়ে গেল দু'দিকে। আর হযরত ইয়াসেরের দেহটা মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গেল। ফলে তিনি ছটফট করতে করতে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

স্ত্রী সুমাইয়া (রা) ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কাফেরদের চালানো বর্বরতা দেখছেন। একদিকে প্রাণপ্রিয় ছেলের খুনমাখা দেহ আর অন্যদিকে স্বামীর দু'টুকরো লাশ। পাষাণ্ড কাফের নেতা আবু জাহেল হেসে বলল, 'দেখলি তো। এখনও বলি ইসলাম ছাড়। ছাড়লে বাঁচবি।'

অথচ অত বর্বরতা দেখেও হযরত সুমাইয়া অনড় রইলেন। তিনি শুধু বললেন, 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ।' এ কথা শুনে আর কিছুই ভাবতে পারল না আবু জাহেল। একেবারে রেগে লাল হয়ে গেল সে। রাগে-ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে গিয়ে একটা বর্শা নিয়ে এলো আবু জাহেল। তারপর খুব জোড়ে সেটি সুমাইয়ার পেটের নিচে বসিয়ে দিলো। একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। ছটফট করতে করতে সেখানেই শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন হযরত সুমাইয়া। ইসলামে ইনিই হলেন পয়লা মহিলা শহীদ।

এভাবে আরও অগণিত মুসলমানের ওপর জুলুম চালাল কাফের বেঈমানরা। এসব দেখে নবীজী বুকফাটা হাহাকার করতেন। তিনি ধৈর্যের সাথে এসব সহ্য করতেন আর বিশ্বজাহানের মালিক মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।

বলতে পারো?

১. নবী মুহাম্মদ (সা)-কে আক্রমণ করলে কে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন? তার পরিণতি কী হলো?
২. উমাইয়া কার ওপর অত্যাচার চালাল? তাঁর ওপর কিভাবে নির্যাতন করা হলো?
৩. এক পরিবারের ক'জন সদস্যের ওপর কাফেররা অত্যাচার চালাল? তাঁদের নাম কী?
৪. হযরত ইয়াসেরকে কিভাবে শহীদ করা হলো?
৫. হযরত আম্মার (রা)-কে কিভাবে শহীদ করা হলো?
৬. হযরত সুমাইয়া (রা) কী ধরনের অত্যাচারের শিকার হলেন?

নবীজীর ওপর চালানো হলো অত্যাচার

সময় বয়ে বয়ে যায়। বছর আসে ঘুরে ঘুরে। মহানবী (সা)-এর অনুসারীদের ওপর জুলুম করে সাধ মিটে না যেন কাফের পশুদের। তারা এবার মহানবী (সা)-এর ওপর অত্যাচার চালাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। একদিন সাফা পাহাড়ের এক গুহায় বসেছিলেন মহানবী (সা)। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো আবু জাহেল। সে এসেই নবীর নাম ধরে গালাগাল দিতে শুরু করল। আল্লাহর নবী তার কথার কোনো জবাব দিলেন না, বরং তিনি সবর করে গেলেন।

গালাগালিতে কোনো কাজ হলো না দেখে আবু জাহেল হতাশ হলো। এবার সে ইসলাম আর মুসলমানদের নাম নিয়ে কটু কথা বলতে শুরু করল। এতেও মহানবী (সা) চুপচাপ রইলেন, একেবারে পাথরের মতো। কিছুতেই কিছু হলো না দেখে এক টুকরো পাথর তুলে নিলো আবু জাহেল। সেটাই সে সজোরে ছুড়ে মারল মহানবী (সা)-এর ওপর।

পাথর গিয়ে আঘাত করল নবীজীর মাথায়। এতে তাঁর কপাল ফেটে গেল। কপাল থেকে হু হু করে খুন বেরিয়ে এলো। ফলে লালে লালে হয়ে গেল নবী (সা)-এর মুখ, জামা-কাপড়। হাত দিয়ে রক্ত চেপে ধরলেন নবীজী। তারপরও কাফেরদের তিনি কিছুই বললেন না। একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হলো না, বরং তিনি সবর করলেন এবং ভরসা করলেন মহান আল্লাহর ওপর।

এভাবেই চলে যাচ্ছে দিন। অত্যাচার নিপীড়ন দিনকে দিন বেড়েই চলছে। কাফেররা পিছু ছাড়ছে না নবীজীর। আল্লাহর নবীও হতাশ হলেন না। তিনি দীনের কাজ চালিয়ে গেলেন অবিরাম গতিতে। একদিন কাবা প্রাঙ্গণে এক মনে নামায পড়েছিলেন মহানবী (সা)। যেই রুকুতে গিয়ে নিচু হয়েছেন, অমনি পেছন থেকে ছুটে এলো কাফের ওকবা। এসেই সে হযরতের গলায় ফাঁস পরাল। এমন ফাঁস যে আর দম নেয়া যাচ্ছিল না। চোখ বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হলো। হয়তো তারা নবীকে মেরেই ফেলত। হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মহানবী (সা)-এর বন্ধু আবু বকর (রা)। তিনি কোনো রকমে ওকবাকে ছাড়িয়ে নিলেন।

আরেক দিনের ঘটনা। ঐ দিনও কাবা প্রঙ্গণে নামায পড়ছিলেন মহানবী (সা)। সেজদায় যেতেই হঠাৎ পেছন থেকে তাঁর পিঠের ওপর ফেলা হলো একটা উটের পচা নাড়িভুঁড়ি। দম আটকে গেল তাঁর। এ ঘটনা নবীজীর কন্যা হযরত ফাতেমার নজরে পড়তেই তিনি দৌড়ে ছুটে এলেন। তড়িঘড়ি করে নাড়িভুঁড়ি সরিয়ে পিতাকে উদ্ধার করলেন।

সাফা পাহাড়ে কাফের আবু জাহেল ঐ যে পাথর মেরেছিল, একটা দাসী দেখেছিল সেই ঘটনা। দাসী বাড়ি গিয়ে সব ঘটনা হযরত হামযা (রা)-কে অবগত করাল। হামযা (রা) নবীজীর চাচা। বয়সে দু-তিন বছরের বড়। দু'জনে একসঙ্গে অনেক খেলেছেন, বেড়িয়েছেন। তাই মহানবী (সা)-এর সঙ্গে তাঁর খুব সৎভাব ছিল। তিনি ছিলেন মহাবীর। তিনি সবেমাত্র হরিণ শিকার থেকে বাড়ি ফিরেছেন। ফিরেই দাসীর মুখে শুনলেন এ ঘটনা, আর অমনি ক্ষেপে গেলেন। তিনি শিকারির বেশেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আবু জাহেল তখন কাবার চত্বরে বসে আরাম করছিল। হামযা (রা) সেখানে এসে চিৎকার করে বললেন, 'এই আবু জাহেল, কোথায় রে বেয়াদব?'

চড়া গলা শুনে চমকে উঠল আবু জাহেল। তার মুখ শুকিয়ে গেল। হামযা (রা)-এর চোখ দেখে আবু জাহেল ভয় পেয়ে গেল। তারপর আমতা আমতা করে বলল, 'আমাদের ঠাকুরের মান রাখার জন্য তোমার ভাইপোকে একটু মেরেছি, এই আর কী।'

আর কোনো কথা নয়। হযরত হামযা (রা) তাঁর হাতের ধনুক ঘুরিয়ে সজোরে মারলেন আবু জাহেলের মাথায়। এতে হু হু করে খুন বেরিয়ে এলো। বীর হামযা (রা) চিৎকার করে বললেন, 'আবু জাহেল! মনে রাখিস, এরপর সাবধান হয়ে কাজ করবি'।

আবু জাহেল দেখল, বড়ই বিপদ! হামযার সাথে তর্ক করে এমন সাহস তার নেই। তাই সে নিজের অপরাধ মেনে নিলো। হামযা (রা) তখনকার মতো তাকে ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন। এখানেই শেষ নয়। তারপর আরও অনেক নিপীড়ন নির্যাতন চলেছিল মহানবী (সা)-এর ওপর।

বলতে পারো?

১. একদিন মহানবী (সা)-এর ওপর আবু জাহেল কী ছুড়ে মারল?

২. নবী (সা) নামাযের সেজদায় গেলে কাফেররা কী করল?

৩. হামযা (রা) আবু জাহেলের অত্যাচারের কী প্রতিকার নিলেন?

মহানবী (সা) তায়েফে গেলেন

মক্কায় ক'টা দিন ভালোই কাটল মহানবী (সা)-এর। তবে শীঘ্রই তাঁর ওপর নেমে এলো কঠিন বিপদ। এতিম নবীর চাচা আবু তালিব ইতোমধ্যে ইন্তেকাল করলেন। তাঁর আপদবিপদের আশ্রয় বলতে দুনিয়ায় আর কেউ রইল না। মহানবী (সা)-এর মনে তাই বড় কষ্ট। চাচাকে হারানোর ব্যথা ভুলতে না ভুলতে স্ত্রী খাদিজাও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক'দিন পর তিনিও দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে গেলেন। মহানবী (সা) এরপর সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেন। তাই তাঁর মনটা একেবারে ভেঙে পড়ল।

কিন্তু তিনি তো আল্লাহর নবী। শত বিপদেও দমবার পাত্র নন তিনি। তাই আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার কাজে তিনি পিছ পা হলেন না, বরং তিনি দীনের কাজে আরও বেশি মনোনিবেশ করলেন। ফলে বেড়ে চলল জুলুমের মাত্রাও। কাফের-দুশমনরা আরও বেশি মারমুখী হয়ে উঠল। তাদের অত্যাচার যে আর সহ্য করা যায় না। কী করা যায় এখন! মহানবী (সা)

ভাবনায় পড়ে গেলেন। অনেক ভাবনা চিন্তার পর তিনি ঠিক করলেন মক্কায় আপাতত দীন প্রচারের কাজ বন্ধ রাখবেন। তিনি তায়েফকে দীন প্রচারের কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন। তাই নবী (সা) চলে গেলেন তায়েফে। মক্কা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত এই তায়েফ। মহানবী (সা) মনে মনে ভাবলেন, তায়েফের লোকেরা হয়তো আল্লাহর কথা শুনবে। কিন্তু না, ফল হলো উল্টো।

মহানবী (সা)-এর কথা শুনে তায়েফবাসী চরম ক্ষুব্ধ হলো। তাঁর কোনো কথাই তারা শুনতে চাইল না, বরং তারা মহানবী (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করল। নবীজীর ওপর চড়াও হয়ে লোকেরা তাঁর প্রতি পাথর ছুড়ে মারল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাথর এসে মহানবী (সা)-এর ওপর পড়তে লাগল। ফলে তাঁর সুন্দর পবিত্র দেহ পাথরের আঘাতে ঝাঁঝরা হলো, ক্ষতবিক্ষত হলো। রক্তাক্ত হলেন দীনের খাদেম, মহানবী (সা)। মারের চোটে এক সময় মহানবী (সা) মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। জ্ঞান হারালেন তিনি। জ্ঞান ফিরে এলে অত্যাচারী তায়েফবাসীর ব্যবহারের জন্য মনে দুঃখ পেলেন তিনি। কিন্তু নবী (সা) তাদের জন্য কোনো বদদোয়া করলেন না।

তখন আল্লাহপাক তাঁর নবীর মনোকষ্ট লাগবের জন্য ফেরেশতা জিব্রাঈল (আ)-কে পাঠালেন। জিব্রাঈল (আ) তায়েফের পাহাড় উল্টে দিয়ে তায়েফবাসীকে নিঃশেষ করে দিতে নবীজীর অনুমতি চাইলেন। আল্লাহর নবী তাতে রাজি হলেন না, বরং তিনি দু'হাত তুলে অবুঝ তায়েফবাসীর হেদায়াতের জন্য দোয়া করলেন। তিনি তায়েফবাসীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমত চাইলেন। অবশেষে তিনি ফিরে এলেন মক্কায়।

ব ল তে পা রো ?

১. চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পর মহানবী (সা) কী করলেন?

২. মহানবী (সা) তায়েফে গেলে তাঁর প্রতি কী আচরণ করা হলো?

৩. তায়েফে মহানবী (সা)-এর শারীরিক অবস্থা কেমন হলো?

৪. তায়েফবাসীর জন্য মহানবী (সা) কী কামনা করলেন?

মহানবী (সা) মদীনায় গেলেন

মুসলমানদের ওপর কাফেরদের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলল। ফলে মক্কায় ইসলামের কাজ কঠিন হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র এক হুকুমও পেলেন মহানবী (সা)। আল্লাহতাআলা তাঁকে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই নবীজী মদীনায় যাওয়ার জন্য সব প্রস্তুতি নিলেন। মহানবী (সা)-এর কাছে ছিল অনেক মানুষের আমানত। এটার হেফাযতের দায়িত্ব কাকে দেবেন? হযরত আলী (রা)-এর ওপর দিলেন সেই দায়িত্ব। তাই তাঁকে নিজের বিছানায় শুইয়ে রেখে মহানবী (সা) এক গভীর রাতে মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা করলেন। সাথে নিলেন প্রাণপ্রিয় সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা)-কে।

এদিকে কাফেররা নবী (সা)-কে খুন করার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করল। কিন্তু তিনি আল্লাহর কুদরতে বাড়ি থেকে নিরাপদে বেরুতে পারলেন। কাফেররা এটা টেরও পেল না, কিছু বুঝতেও পারল না। তাই তারা হতাশ

হলো। মহানবী (সা)-কে যেভাবেই হোক ধরা চাই। তাই তাঁকে ধরার জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। দুশমনরা নবীজীর খোঁজে ছুটল চারদিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন মহানবী (সা) ও তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রা)। দুশমনরা গুহার কাছে এসেও খোঁজ করল।

মাকড়সা এসে জাল বুনেছিল গুহার মুখে। সেটাও ছিল আল্লাহরই অশেষ কুদরত। মাকড়সার জাল দেখে কাফেররা ভাবল, গুহায় হয়তো কেউ নেই। তাই তারা ব্যর্থ মনোরথে মক্কায় ফিরে গেল। তিনদিন সওর গুহায় অবস্থান করার পর নবীজী আবার মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন। অবশেষে তিনি কোবায় গিয়ে পৌঁছলেন। কোবা মদীনার একদম কাছাকাছি একটি স্থান। কোবার মানুষ প্রিয়নবী (সা)-কে পেয়ে তাঁকে প্রাণভরে স্বাগত জানাল। এখানে তিনি থাকলেন ১৪ দিন। কোবায় মহানবী (সা) একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

অবশেষে মহানবী (সা) মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন। মদীনাবাসী আল্লাহর নবীকে পেয়ে খুব খুশি হলো। তিনি আশ্রয় নিলেন আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে। এখানে দলে দলে লোক আসে নবীজীকে একনজর দেখতে। সবাই নবীজীর কথা শোনে। ভালো ভালো কথা বলেন তিনি। এসব কথা শুনে লোকেরা ঈমান আনে, মুসলমান হয়। এভাবে দিন দিন খুব দ্রুত বাড়তে থাকে মুসলমানের সংখ্যা।

বলতে পারো?

১. মক্কা থেকে মহানবী (সা) কোথায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

২. মানুষের আমানত নবী (সা) কার কাছে দিয়ে গেলেন?

৩. মহানবী (সা) কাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলেন?

৪. সওর গুহায় থেকেও মহানবী (সা) ও আবু বকর (রা) কিভাবে বেঁচে গেলেন?

মদীনায় গড়লেন সুন্দর সমাজ

মদীনায় হিজরত করে মহানবী (সা) এবার মোটামুটি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে ইসলামের এক শক্ত ভিত তৈরি হলো মদীনায়। মুসলমানরা একত্র হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তাই মুসলমানদের ইবাদাতের জন্য একটা আলাদা জায়গা দরকার হয়ে পড়ল। জায়গাও পাওয়া গেল। মহানবী (সা) নিজ হাতে সেখানে গড়ে তুললেন এক মসজিদ। এর নাম মসজিদে নববি। হযরত বেলাল (রা) এ মসজিদে প্রথম আজান দিলেন।

এভাবে মুসলমানরা নামাযের জন্য প্রতিনিয়ত একত্র হতে লাগল। তারা সংঘবদ্ধ হলো। মদীনায় অনেক লোক। অনেক গোত্র। কেউ ইহুদি। কেউবা নাসারা। তাই নবীজী ভাবলেন, সবার সাথে একটা সমঝোতা করা দরকার। তাঁর চিন্তা, সমাজে যাতে কোনো সংঘাত না ঘটে, কোনো অশান্তি না হয়। সবাই নবীজীর কথায় একমত হলো।

আলোচনা করে একটা দলিল লেখা হলো। দলিলের অনেক শর্তের মধ্যে কয়েকটি শর্ত ছিল এ রকম : ১. কেউ কারও ওপর জুলুম করবে না।

২. সকলে মিলেমিশে বাস করবে। ৩. কারও ওপর হামলা হলে সকলে মিলে তার মোকাবেলা করবে। ৪. দুশমন হামলা করলে সকলে মিলে দুশমনের সাথে লড়বে। ৫. সকলে মিলে মদীনাকে বাঁচাবে। দুশমনদের কেউ ঠাঁই দেবে না, এবং ৬. নিজেদের ভেতর কোনো বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে ফেলবে। যদি না মেটে মুহাম্মদ (সা)-কে জানাবে। তিনি যা বলবেন তা সকলে মেনে নেবে।

এই দলিলে সই করল সবাই। এটাই হলো জগতে দেশ শাসনের প্রথম লিখিত দলিল। ইতিহাসে এটা 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। এর আগে যে যার মতো করে মদীনারাষ্ট্র শাসন করত। এই সনদ অনুযায়ী মদীনার শাসনভার এলো মহানবী (সা)-এর হাতে।

মহানবী (সা) চিরদিন মিলেমিশে বাস করতে চেয়েছেন। মদীনার মানুষও তাই চাইত। এমন একজন ভালো লোক পেয়ে তাই মদীনার সকলে খুশি হলো। মদীনায় মহানবী (সা)-এর দিনগুলো মোটামুটি ভালোভাবে কাটতে লাগল। মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলল। মহানবী (সা)-এর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ফুলের খোশবুর মতো হাওয়ায় ভাসতে থাকে তাঁর সুনামের সৌরভ। মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর সুনামের ঢেউ মক্কায় তাঁর জন্মভূমিতে এসেও আঘাত হানল।

বলতে পারো?

১. নবী (সা) মদীনায় কী তৈরি করলেন? এই মসজিদের নাম কী?

২. মদীনায় মিলেমিশে থাকার জন্য মহানবী (সা) কী করলেন?

৩. মদীনা সনদের কয়েকটি শর্ত কী কী ছিল?

হুদায়রিয়ার সন্ধি

মহানবী (সা) মদীনায় ফিরে গেলেন

তখন হিজরি ছয় সাল। মহানবী (সা) মক্কা ছেড়েছেন ছয় বছর আগে। কতদিন তিনি কাবাশরীফ দেখতে পাননি! তাই তাঁর মন উতলা হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে জিলকদ মাস এসে পড়ল। তিনি ঠিক করলেন এবার হজ করতে যাবেন। নিজের জন্মভূমি দেখবেন, কাবাশরীফ জিয়ারত করবেন।

অবশেষে একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন মক্কার পথে। দেড় হাজার সাহাবী তাঁর সঙ্গী হলেন। মক্কায় তখন এক ভালো রেওয়াজ ছিল। হজের মাসে কেউ মারামারি করে না। খুন জখম করে না। লুটপাট করে না। তাই নবীজী নিরাপত্তার জন্য বিশেষ আর কিছু সঙ্গে নিলেন না। তা ছাড়া তারা তো কেবল হজ করতেই যাচ্ছেন, মারামারি করতে নয়, লড়াই করতে নয়। আল্লাহর নাম নিয়ে সবাইকে সাথে করে পথে নামলেন নবীজী।
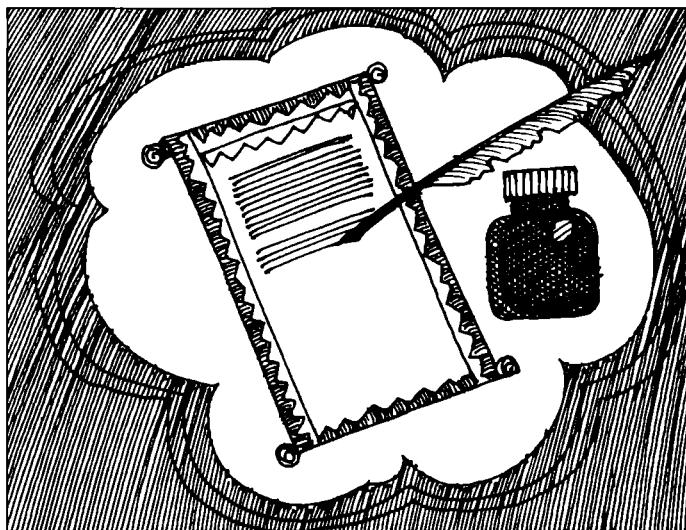
ক'দিন পথ চলার পর তারা হুদায়রিয়া নামক স্থানে এসে থামলেন। মক্কার অনতিদূরে এই হুদায়বিয়া। এখানে এসে নবীজী শুনলেন, কুরাইশরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তারা কিছুতেই মুসলমানদের মক্কায় যেতে দেবে না। হজ করতে দেবে না। শুধু তাই নয়, বীর খালেদ এরি মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে মুসলমানদের প্রতিরোধের জন্য। সঙ্গে দুশো ঘোড়সওয়ার। তার ইচ্ছা সে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করবে।

একথা শোনার পর মহানবী (সা) আর সামনে এগুলেন না। হুদায়বিয়াতেই তাঁবু গাড়লেন। বোদায়েল নামের একজন লোককে তিনি পাঠালেন কুরাইশদের কাছে। সে গিয়ে কুরাইশদের বোঝাল, 'হযরত সত্যিই হজ করতে এসেছেন। অন্য কোনো মতলব নিয়ে আসেননি। কেননা, তাঁর সাথে কুরবানির উট রয়েছে।' তবুও কাফেররা তা বুঝতে চাইল না। অবশেষে নবীজী হযরত উসমান (রা)-কে মধ্যস্থতার জন্য মক্কায় পাঠালেন। তিনি মক্কায় কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন। কোনো কথা তিনি গোপন করলেন না। শেষে একটা মিটমাটের কথা বললেন। বলতেই কুরাইশরা রেগে গেল। তারা উসমান (রা)-কে আটক করে রাখল। এদিকে হযরত উসমান (রা) ফিরে না আসায় নবীজী তো পেরেশান। তাঁর সাথীরা তো সবাই উদ্বিগ্ন।

অনেকক্ষণ পর নবীজীর কাছে এক সংবাদ এলো। খবরে জানা গেল, হযরত উসমান (রা)-কে কুরাইশরা হত্যা করেছে। সংবাদ শুনে মুসলমানদের মধ্যে

প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হলো। তারা আর বসে থাকতে পারলেন না। সবাই একটি বাবলা গাছের তলায় গিয়ে সমবেত হলেন। তারপর নবীজীর হাতে হাত রেখে শপথ করলেন– 'আমরা লড়াই করব। উসমান হত্যার বদলা ছাড়া জীবন নিয়ে কেউ ফিরে যাব না।'

এটা ছিল এক কঠিন শপথ। এক কঠিন পণ। সকলেই লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়ে গেলেন। এ সংবাদ ক্ষণিকের মধ্যেই কুরাইশদের কানে পৌঁছে গেল। তারা জানতে পারল, মুসলমানরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তারা সবাই লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মুসলমানরা লড়াই করে মরবে তবু মদীনায় ফিরে যাবে না।

এ খবর শুনে কুরাইশরা খুব ভয় পেয়ে গেল। তাদের ভেতর অনেকেই তখন বলল, অন্যায় তো আমাদের। হজের মাসে হজ করবে সবাই, আমরা বাধা দেব কেন? কাফেরদের নিজেদের ভেতরও ক্ষোভ দেখা দিল। শেষমেশ বিরোধ মিটমাটের জন্য তারা তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে দিল মহানবী (সা)-এর কাছে। তখন দু'দল মিলে একটা সনদ তৈরি করল। একেই 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' বলে। এই দলিলে যা লেখা হলো তার কিছু কথা ছিল এ রকম : ক. এ বছর মুসলমানগণ হজ না করে ফিরে যাবে। খ. তারা আগামী বছর হজে আসবেন। তিনদিন থাকবেন কাবায়। তারপর হজ করে চলে যাবেন। গ. তারা সঙ্গে কেবল তরবারি আনতে পারবেন। তবে তা খাপের ভেতর রাখতে হবে। ঘ. মক্কার যে কেউ মদীনায় এলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। আর মদীনার কেউ মক্কায় এলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।

এ দলিলে দু'পক্ষ সই-স্বাক্ষর করল। মুসলমানরা অনেকেই এ চুক্তিকে মেনে নিতে চাইলেন না। কেননা, দলিলের সব কথাই তাদের কাছে অপমানজনক বলে মনে হলো। কেউ কেউ বলল, এমন দলিল করা ঠিক হলো না। সকলকে থামিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, 'আল্লাহর রাসূল (সা) যা করেছেন তা অবশ্যই ঠিক। সকলের তা মেনে নেয়া উচিত।'

তবুও নানাজন এটা নিয়ে নানান কথা বলতে লাগল। বলতে বলতে মুসলমানরা মদীনার পথে চলা শুরু করলেন। মাঝ পথে জিব্রাঈল (আ) এলেন ওহি নিয়ে। আল্লাহ হুদায়বিয়ার এ ঘটনাকে 'মহাবিজয়' বলে ঘোষণা করলেন। নবীজী সাথে সাথে সকলকে জানালেন এই ওহির কথা। এরপর সকলে চুপ হয়ে গেলেন। চুক্তিকে সবাই খুশি মনে মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানরা কুরাইশদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলেন। কোনো বাধা আর রইল না। দু'পক্ষের অবাধ মেলামেশা হলো। মুসলমানরা গিয়ে গরিব কুরাইশদের পাশে দাঁড়ালেন। তাদের রোগে-শোকে সেবা করলেন। মাথায় শীতল হাত বুলিয়ে দিলেন।' একেবারে আপনজনের মতো। এসব আচার ব্যবহার পেয়ে মক্কার সাধারণ লোকেরা অভিভূত হয়ে গেল। এর ফলে হলো কী, দলে দলে কাফেররা মহানবী (সা)-এর সান্নিধ্যে এলো এবং মুসলমান হতে শুরু করল।

এর আগে সতের বছরে যত লোক মুসলমান হয়েছিল, এই দেড় বছরে তার দ্বিগুণ লোক মুসলমান হয়ে গেল। এমনি করে আল্লাহতাআলা মুসলমানদের জন্য তাঁর ঘোষিত মহাবিজয় এনে দিলেন। কুরাইশদের শক্তির কঠিন ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল।

ব ল তে পা রো ?

১. মহানবী (সা) কত হিজরি সালে হজ করতে গেলেন?
২. পথিমধ্যে মহানবী (সা) কোথায় তাঁবু গাড়লেন?
৩. মুসলমানরা কী জন্য নবীজির হাতে শপথ নিলেন?
৪. হুদায়বিয়া সন্ধির কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করো।

মক্কা বিজয় ও বিদায় হজ

হিজরি আট সালের কথা। হুদায়বিয়া সনদে কুরাইশদের সঙ্গে বিরোধের যে মিটমাট হয়েছিল তা কুরাইশরা আর মানতে চাইল না। তারা আগের মতো কাজ শুরু করে দিল। সেই আগের মতোই জুলুম অত্যাচার, খুন-জখম শুরু করল। একটা বংশের অনেক লোককেও তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করল।

নবীজী তাই আবার ভাবতে শুরু করলেন, তা হলে কী করা যায়? তিনি ঠিক করলেন, হঠাৎ গিয়ে মক্কা ঘিরে ফেলবেন, চারদিক থেকে, কুরাইশদের কিছু বোঝার আগেই। যেই পরিকল্পনা সেই কাজ।

দু'চার দিনেই মুসলমানদের পক্ষে সব প্রস্তুতি শেষ করা হলো। এবার সেনাদলে এলেন দশ হাজার মুসলমান। সে অনুযায়ী ঘোড়া, উট, তীর, ধনুক, ঢাল সবই জোগাড় হলো। সেদিন ছিল ৬৩০ সালের জানুয়ারি মাস। হিজরি আট সালের দশ রমজান। মহানবী (সা) বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কার পথে বেরিয়ে পড়লেন। মক্কার খুব কাছাকাছি 'মারুজ জাহরান' নামে একটি পাহাড়ি এলাকা। মহানবী (সা)-এর সেনাবাহিনী যখন এখানে এলো তখন সন্ধ্যা প্রায় নেমে এসেছে। এখানেই সকলকে রাঁধা-খাওয়া করতে আদেশ
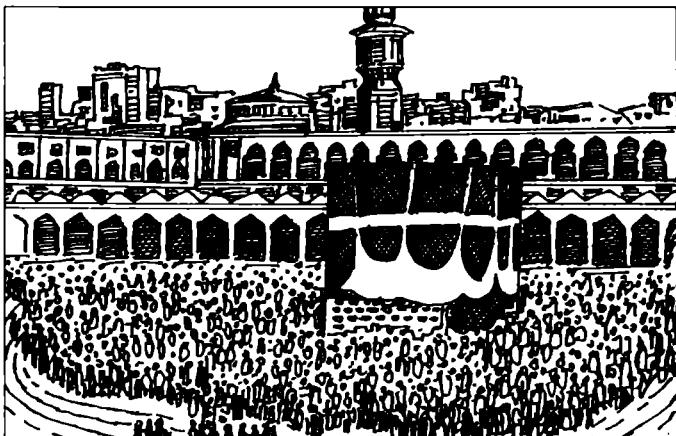
দিলেন মহানবী (সা)। বিশাল পাহাড়জুড়ে হাজার মশাল জ্বালানো হলো। আলোয় আলোয় ভরে গেল গোটা এলাকা। এমন দৃশ্য কেউ কোনদিন দেখেনি। দূর থেকে এই হাজারো মশালের আলো মক্কার কাফের কুরাইশদের কাছে ভয়ানক বলে মনে হলো। তাই তারা ঘাবড়ে গেল।

হঠাৎ করে এত কাছে চলে এসেছে মুসলমানরা! মক্কার কাফেররা অবাক হলো। তবে আর কিছুই করার ছিল না তাদের। আবু সুফিয়ান এবং আরও কয়েক জনকে কাফেররা মুসলমানদের ভেতর পাঠিয়ে দিল খবর নেয়ার জন্য। কিন্তু খবর নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল আবু সুফিয়ান। সে ছিল মহানবী (সা)-এর জানের দুশমন। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাজির করা হলো মহানবী (সা)-এর কাছে। বদর, ওহুদ, খন্দক সব লড়াইয়ের মূল হোতা ছিল আবু সুফিয়ান। কত মুসলমানের রক্তে যে তার হাত রঞ্জিত তার ইয়ত্তা নেই। তাই মুসলমানদের অনেকেই দাবি করলেন, এত বড় দুশমনকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। তাকে খুন করা হোক। টুকরো টুকরো করা হোক। অনেকে যখন 'খুন' 'খুন' বলে দাবি তুলছে, নবীজী তখন নীরব। একটু পর তিনি আবু সুফিয়ানের মুখের দিকে তাকালেন। মধুর গলায় ডাকলেন, 'আবু সুফিয়ান! এখনও কি তুমি ঠাকুর দেবতার ওপর ভর করে আছ? এখনও কি তাদের ওপর ভরসা আছে তোমার?'
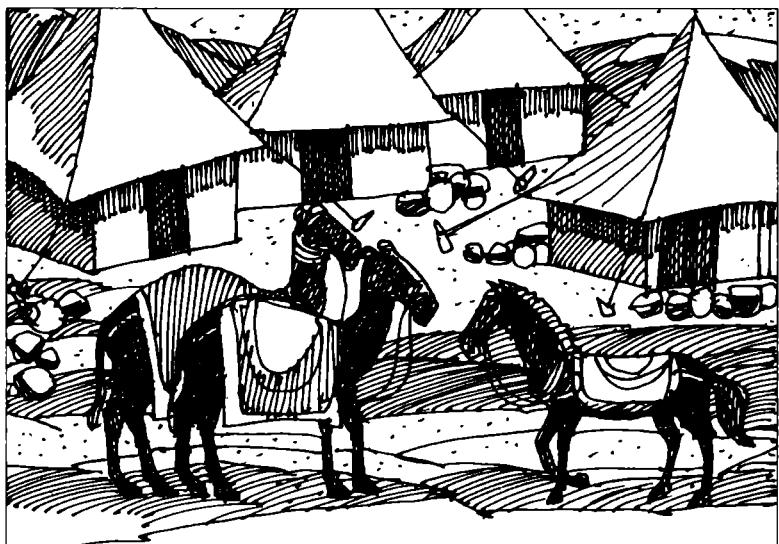
মহানবী (সা)-এর কথা শুনে আবু সুফিয়ানের গলা কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, 'না হযরত ! আর ভরসা নেই। ঠাকুরগুলো সত্য হলে এই কঠিন বিপদে তারা এগিয়ে আসত। এসে আমার পাশে দাঁড়াত। আমাকে সাহায্য করত।'

মহানবী (সা) আবারো মধুর কণ্ঠে বললেন, 'তা হলে কি তুমি এখনও বলবে না, আল্লাহ এক?'

এবার নীরব থাকলেন না আবু সুফিয়ান। থাকতে পারলেন না। পাহাড়ি হওয়ায় দোলা জাগিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'— আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল।

এভাবে ইসলাম কবুল করলেন আবু সুফিয়ান। এত দিনের জানি দুশমন আজ হলেন আপনজন। তিনি মুসলমান হলেন। এ সময় মরুভূমিতে যে খুশির ঢেউ বয়ে গেল তা কল্পনা করাও কঠিন।

মক্কা অভিযানের এই দিনে মহানবী (সা) কাউকে হত্যা করতে চাননি। তাই তিনি আবু সুফিয়ানের মারফত মক্কায় মানুষকে খবর পাঠালেন। তিনি ঘোষণা করলেন : ক. যে আবু সুফিয়ানের ঘরে থাকবে সে নিরাপদ। খ. যে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে থাকবে সে নিরাপদ। গ. যার কাছে তরবারি থাকবে না সে নিরাপদ। ঘ. যে কাবার ভেতরে থাকবে সে নিরাপদ।

মক্কায় এসে আবু সুফিয়ান মহানবী (সা)-এর এসব কথা হুবহু ঘোষণা করে দিলেন। সকলকে শুনিয়ে তিনি আরও বললেন, 'এখন আমি আর তোমাদের দলে নেই। আমি এখন মুসলমান।'

দেখতে দেখতে বিশাল মুসলিম বাহিনী এসে ঢুকে পড়ল মক্কা শহরে। তাদের হাতে ইসলামের পতাকা। সেই পতাকা খুশিতে পতপত করে উড়ছিল। মুসলমানদের কণ্ঠে 'নারায়ে তাকবির' ধ্বনি। সে আওয়াজ মক্কার আকাশ বাতাস জাগিয়ে তুলল। মুসলমানদের বাধা দেওয়ার মতো কেউ থাকল না। মুসলিম সেনাবাহিনী এগিয়ে চলছে। ইসলামের বড় দুশমন আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা। সে মুসলমানদের শক্তি বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে অতর্কিত হামলা চালাল মুসলিম বাহিনীর ওপর। এই অতর্কিত হামলায় মুসলমানদের দু'জন শহীদ হয়ে গেলেন। তরবারি চালানো নিষেধ ছিল নবীজীর। তাই মুসলমানরা চুপ করে ছিলেন। এক সময় তারা রুখে দাঁড়ালেন। ফলে ইকরামার দলের আটাশ জন সাথে সাথে কচুকাটা হয়ে গেল। এই পরিণতি দেখে অন্যরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল।

মক্কা বিজয় হয়ে গেল। এটা ছিল এক মহান বিজয়। এ বিজয় সত্যের বিজয়। এক সময় বিজয়ীর বেশে মহানবী (সা) এসে দাঁড়ালেন কাবার সামনে। এ সেই কাব– যার সামনে তাঁকে বহুদিন অপমানিত হতে হয়েছে। এ মাটিতে তাঁর অনেক খুন ঝরেছে। অথচ সেখানে আজ আর কোনো বাধা নেই। সবই মহান আল্লাহর কুদরত। যেই কাফেররা নবীজীর ওপর জুলুম করত, মুসলমানদের অত্যাচারে জর্জরিত করত তারা আজ হাতজোড় করে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপা কাঁপা হাত একত্র করে করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মুসলিম বীর সেনারা। তাদের হাতে খোলা তরবারি। কেবল নবীজীর ইশারার অপেক্ষায়। এক এক কোপে শেষ হয়ে যাবে সব। আজ আর কোনো দয়া নেই। কোনো মায়া নেই। কোনো মাফ নেই।

মুসলমানদের সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। কখন নবীজী আদেশ দেবেন। সকলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওদিকে কুরাইশরা নবী (সা)-এর এতটুকু দয়া পাওয়ার জন্য কাতর। হঠাৎ নবীজী তাকালেন সকলের দিকে। সেই শয়তানগুলোর মুখের দিকে। একটু যেন কী ভাবলেন। তারপর মুখ খুললেন এবং বললেন : 'আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের সবকিছু মাফ করে দিলাম।'

হঠাৎ করে গোটা জগৎ যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। কুরাইশরা যা ভাবতে পারেনি এক নিমিষে তাই ঘটে গেল। তারা অবাক হলো, বিস্মিত হলো। তারা ভাবতে শুরু করল। নবীজী এত দয়ালু! এত মহান! আর এই মানুষের ওপর আমরা কী না অত্যাচার করেছি এতদিন! তাই তারা আর ফিরে গেল না। দেহমন সব রাসূল (সা)-এর পায়ে সঁপে দিল। তারা দলে দলে মুসলমান হয়ে গেল। এরপর কাবা শরীফ থেকে সব মূর্তি টেনে বের করা হলো। এগুলো ভেঙে ফেলা হলো।
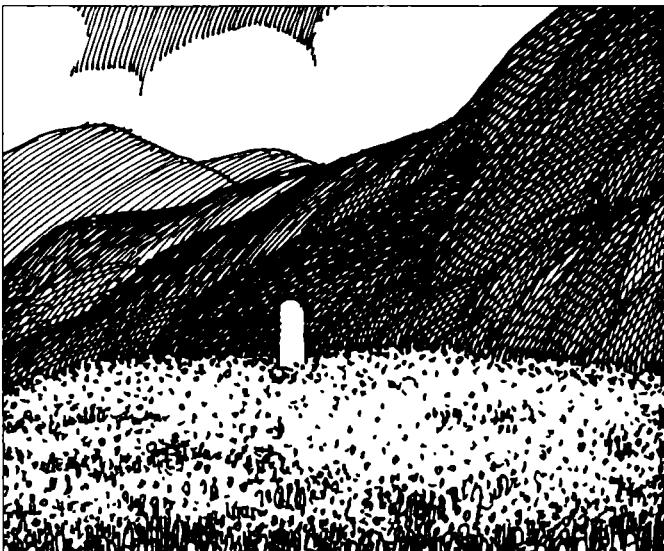
এলো দশম হিজরি। জিলহজ মাস। মহানবী (সা) ঘোষণা করলেন : 'এবার আমি হজ করতে যাব। যারা সঙ্গী হতে চায় তারা যেন চলে আসে।' এই ঘোষণায় সারা আরবজাহানে যেন কোলাহল পড়ে গেল। আবেগে উচ্ছ্বাসে ভেসে গেল সব। দলে দলে মানুষ আসতে লাগল। সমবেত হতে শুরু করল হাজার হাজার মুসলমান। মদীনার ময়দান লোকে লোকে ভরে গেল। ৭০ হাজার মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে নবীজী রওয়ানা হলেন মদীনা থেকে। পথের দু'পাশ থেকে আরও অসংখ্য মুসলমান এসে যোগ দিলেন তাঁদের সাথে। হাজীর সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেল। উটের পিঠে চড়ে নয়দিন চলার পর নবীজী মক্কায় এসে হাজির হলেন। লোক আর লোক। সর্বত্র প্রচণ্ড ভিড়। মানুষে

মানুষে চারদিক ছেয়ে গেছে। যতদূর দেখা যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। এ হজ ছিল নবীজীর জীবনের শেষ হজ। তাই এ হজকে 'বিদায় হজ' বলে।

এ হজে বিশাল জনতার সামনে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো ছিল খুব দামি। আমাদের সকলের তা মনে রাখা দরকার। কত ভালো ভালো কথা বললেন নবীজী। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বললেন : ১. আজ আঁধার যুগের শেষ হলো। সে যুগের সব রীতি-নীতি আজ বাতিল করা হলো। এখন থেকে আলোর পথে চলো। ইসলামের পথে চলো। ২. সব মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারও চেয়ে ছোট নয়। কেউ কারও চেয়ে বড় নয়। আল্লাহর চোখে সবাই সমান। ৩. মেয়েদের কথা ভুলো না। তারা পুরুষের সমান। তাদের ওপর জুলুম করো না। ৪. সাবধান! ইসলামে বাড়াবাড়ি নেই। বাড়াবাড়ি করলে শেষ হয়ে যাবে। ৫. নেতার আদেশ মানবে। যদি কোনো নাককাটা কালো দাস তোমাদের নেতা হয় আর সে কুরআন-হাদীস মতে চলে, তবে সে যা আদেশ করবে তা মেনে চলবে। ৬. হত্যা করো না। ৭. বংশের কোনো অহঙ্কার করো না। ৮. আমি তোমাদের কাছে রেখে গেলাম আল্লাহর কুরআন আর আমার আদেশ। যতদিন তোমরা এর মতে চলবে ততদিন তোমাদের পতন হবে না।

হজের যাবতীয় কাজ শেষ হলো। সাহাবীদের বহর নিয়ে মহানবী (সা) ফিরে এলেন মদীনায়।

বলতে পারো ?

১. মহানবী (সা) কখন মক্কা বিজয়ে বের হলেন? তাঁর সাথে কতজন মুসলমান রওয়ানা হলেন?
২. মুসলমানদের খোঁজ নিতে গিয়ে কে বন্দী হলো? বন্দী পরে কিভাবে মুসলমান হলেন?
৩. বিদায় হজে মহানবী (সা) কী কী কথা বললেন?
৪. মক্কা অভিযানে কারা প্রতিরোধ গড়ল? তাদের পরিণতি কী হলো?

মহানবী (সা)-এর বিদায়

হিজরি এগার সাল। বিদায় হজ থেকে ফিরে এসে তিনি এখন অন্য মানুষ। এ জগতে বাস করছেন, তবু তাঁর মন কোথায় যেন পড়ে আছে। তিনি যেন কী ভাবেন। কোথায় যেন যেতে চান। এ দুনিয়া ছেড়ে অন্য কোথাও। হজ থেকে ফেরার পথে নবীজী গেলেন ওহুদের ময়দানে। সেখানে থামলেন। বহু সময় কাটালেন। এখানে তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠল ওহুদ যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনাবলি। চাচা হামযার করুণ শাহাদাত, নিজের দাঁত শহীদ হওয়ার ঘটনা, আরও অনেক সঙ্গী সাহাবীর শাহাদাত এবং যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়– সবই মহানবী (সা)-কে খানিকটা মর্মপীড়ায় আহত করল।
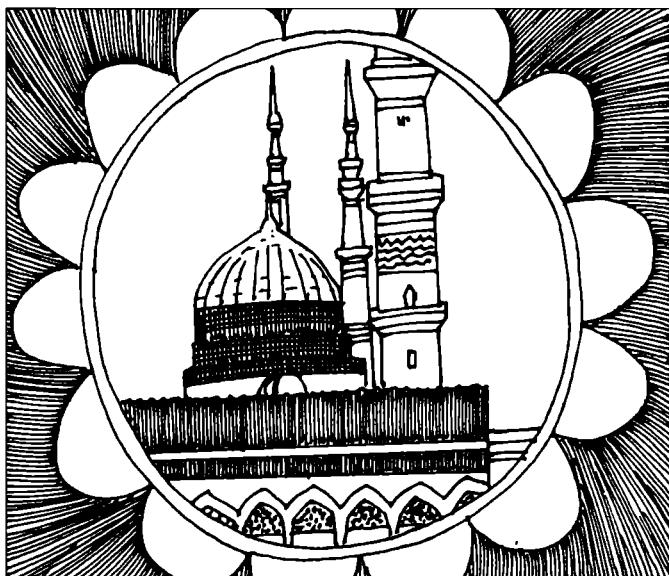
ওহুদের লড়াইয়ে অনেক বীর মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। বললেন, 'হে কবরবাসীগণ! তোমাদের ওপর সালাম। আমরাও তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব।'

জান্নাতুল বাকি। মদীনার বিখ্যাত সমাধি স্থল, বিশাল কবরখানা। মসজিদে নববির পাশে। একদিন গভীর অন্ধকার রাতে নবীজী গেলেন সেখানে। ওপরে আকাশে অনেক তারা মিটমিট করে জ্বলছে। চারপাশে ঘন আঁধার। কেউ জেগে নেই কোথাও। কেবল গভীর রাতের শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া নিথর নীরব গোটা দুনিয়া। নবীজী গিয়ে দাঁড়ালেন সেই সমাধি মাঠের পাশে। সম্পূর্ণ একা তিনি। যেন আর এক জগতের কথা শুনতে এসেছেন এখানে। এখানেও তিনি দাঁড়ালেন অনেক সময়। দোয়া করলেন সকল কবরবাসীর জন্য। বললেন, 'হে সমাধিবাসীগণ! তোমাদের ওপর সালাম। আমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।'

জান্নাতুল বাকি থেকে বাড়ি ফিরে এলেন আল্লাহর নবী (সা)। ফেরার পর অসুখে পড়লেন। বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, বসেও থাকতে পারছেন না। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। মাঝে মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেলছেন। সাহাবীরা পাগল হয়ে উঠলেন প্রিয় নবীর চিন্তায়।

একদিন যন্ত্রণা একটু কমল। তখন মসজিদে গেলেন নবী (সা)। সকলকে কাছে ডেকে বললেন, 'সাবধান! আমার কবরকে উপাসনার জায়গা করো না। পূজার জায়গা করো না। এটা করে অনেক জাতি শেষ হয়ে গেছে।'

আর একদিন অসুখের ঘোরে মসজিদে এলেন নবীজী। ছটফট করছেন তিনি। কী যেন কথা বলা হয়নি। কী যেন বাকি রয়ে গেছে। তাই তিনি উতলা হয়ে পড়লেন। হযরত আলী (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে এলেন। নামায পড়লেন। তারপর ঘোষণা করলেন, 'হে আমার সাথীরা! আমি কোনদিন যদি কাউকেও আঘাত করে থাকি তা হলে এই রয়েছে আমার খোলা পিঠ, তোমরা তেমন আঘাত করে শোধ নিয়ে নাও। আমি যদি কারও জিনিস চুরি করে থাকি আজ আমার জিনিস থেকে তোমরা তা আদায় করে নাও। আমি যদি কাউকে অপমান করে থাকি, সকলের মাঝে আজ আমাকে অপমান করে নাও। আর আমার কাছে যদি কারও কিছু পাওনা থাকে সে বলুক আমি তা দিয়ে দেব।'

জোহর নামাযের পরও ঠিক এই কথাগুলি আবার ঘোষণা করলেন নবীজী। একজন লোক উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! একবার এক ভিখিরিকে দেওয়ার জন্য আপনি আমার কাছ থেকে তিন দিরহাম ধার করেছিলেন।' মহানবী (সা) সঙ্গে সঙ্গে তা মিটিয়ে দিলেন।

একাদশ হিজরি সাল। রবিউল আউয়াল মাসের এক সোমবার। হযরত বেলাল (রা) ফজরের আজান দিলেন। আজান শুনে নবীজী বিচলিত হলেন। বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে আর উঠতে পারলেন না। ইশারায় দরজার পরদাটা সরিয়ে দিতে বললেন। নবীজী দেখলেন, তাঁর সাথীরা জামাতের সাথে নামায আদায় করছেন। তাদের মুখে আল্লাহর নাম। আল্লাহর ধ্যানে তারা বিভোর। এতে খুব খুশি হলেন তিনি। ঈষৎ হাসিতে তাঁর মুখ ভরে উঠল।

নামায শেষ হলো। সকাল ভরে উঠল আলোর আভায়। একটু ভালো বোধ করলেন নবীজী। বেলা হলে আবার শরীরের যাতনা বেড়ে গেল। এক সময় জ্ঞান হারালেন তিনি। চেতনা ফিরে এলে তিনি বললেন, 'সাবধান! তোমাদের দাসদাসীর ওপর কঠোর হয়ো না।' একথা বলে এই চেতনা হারান, এই চেতনা ফিরে পান। এমনি চলতে থাকল। দুপুরের পর থেকে প্রচণ্ড অস্থিরতা দেখা গেল নবীজীর মধ্যে।

এক সময় তাঁকে বেশ খুশি খুশি মনে হলো। তাঁর মুখ যেন উজালা হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে নবীজীর পবিত্র দেহ এক সময় শিথিল হয়ে পড়ল। তিনি চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেলেন। গোটা দুনিয়ার ঈমানদারকে কাঁদিয়ে মহানবী (সা) মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তাঁর তিরোধানে মুসলিম মিল্লাত প্রচণ্ড আঘাত পেল। নবীজীর বিদায়ে সবার মন ভেঙে গেল।

ব ল তে পা রো?

১. জান্নাতুল বাকি কী? সেখানে নবীজি কী করলেন?
২. মহানবী (সা) জান্নাতুল বাকি থেকে ফিরে কী অসুখে পড়লেন?
৩. একদিন অসুখের মধ্যেও মসজিদে নববিতে এসে নবী (সা) কী ঘোষণা করলেন?

মহানবী (সা)-এর মহান হৃদয়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) গোটা দুনিয়ার জন্য উত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন বড় হৃদয়ের মানুষ। তাঁর বিশাল মনের স্পর্শ পেয়ে পথহারা কত মানুষ যে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। মহানবী (সা)-এর প্রতি এটা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত যে তিনি কোমল ও মহান হৃদয়ের মানুষ ছিলেন।

সুমামা নামে ইয়ামামায় এক সর্দার ছিল। তিনি মক্কায় এসে মুসলমান হলেন। এতে মক্কার কাফের কুরাইশরা ক্ষুব্ধ হলো। তাই তারা সুমামাকে অপমানিত করল, মারধর করল। এতে সুমামা খুব ব্যথিত হলেন। আহত অবস্থায় তিনি ফিরে গেলেন তার দেশ ইয়ামামায়।

ইয়ামামা ছিল খাদ্যশস্যে ভরপুর এক ভাণ্ডার। দেশে ফিরেই সুমামা তার গোত্রের লোকদের ডাকলেন। সবাইকে খুলে বললেন তার অপমানের কথা। সুমামার ঘটনা শুনে তার দেশের লোকেরা ভীষণ রেগে গেল। তারা ঠিক করল মক্কায় আর কোনো খাদ্যশস্য পাঠাবে না। অবশেষে তাই করা হলো। এতে মক্কায় হাহাকার পড়ে গেল। খাদ্যের অভাবে সমগ্র মক্কা প্রায়

অচল হয়ে পড়ল। তাই মক্কার কিছু লোক মাফ চাইতে ছুটে 'গেল ইয়ামামায়। তারা সুমামার কাছে ক্ষমা চাইল।

কিন্তু সুমামা বলল, মাফ চাইতে হলে নবীজীর নিকট চাও। তিনি অনুমতি দিলেই তবে তোমাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হবে। সুমামার কথা শুনে কুরাইশদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তাদের চরম দুশমন মুহাম্মদ (সা)। তাঁর কাছে যেয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। সেটা যে খুবই কষ্টদায়ক, অপমানজনক।

কিন্তু কী আর করা! এখন যে জীবনমরণ সমস্যা। বাঁচার অন্য কোনো পথও যে খোলা নেই। অগত্যা তারা মদীনার দিকে ছুটল। ছুটল নবীজীর কাছে। তবে তাদের মনে বড় ভয় হচ্ছিল। তারা জানে মুহাম্মদ (সা) বড় নির্মম ও নিষ্ঠুর মানুষ। তিনি কি তাদের কথায় রাজি হবেন?

এ ভয় নিয়েই অবশেষে তারা মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। তারা ইসলামের নবীকে তাদের দুর্দশার কথা খুলে বলল। কুরাইশদের দুঃখের কথা নবীজী মন দিয়ে শুনলেন। এতে তাঁর মন বিগলিত হয়ে গেল। তিনি লোকদের অভাবের কথা শুনে ব্যথিত হলেন। নবীজী সাথে সাথে মক্কায় খাদ্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন।

মহানবী (সা)-এর বিশাল মন দেখে কুরাইশরা স্তম্ভিত হলো। সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল জগতের নয়নমণি নবী (সা)-এর মুখের দিকে। কী হৃদয়বান মানুষ মুহাম্মদ (সা)!

বলতে পারো?

১. সুমামা কে? সুমামাকে কারা অপমানিত করল?
২. সুমামা দেশে ফিরে কী করলেন?
৩. মক্কার কুরাইশরা কেন ভয় পেল? তারা এ জন্য কী করল?
৪. সুমামা মক্কার লোকদের কার কাছে কেন ক্ষমা চাইতে বললেন?

মহানবী (সা) : ন্যায়বান এক অনন্য মানুষ

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি ছিলেন ন্যায়ের প্রতীক। ন্যায়বিচারের উত্তম আদর্শ ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন অতিশয় ন্যায়পরায়ণ মানুষ। ন্যায়ের ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর আদর্শ বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।
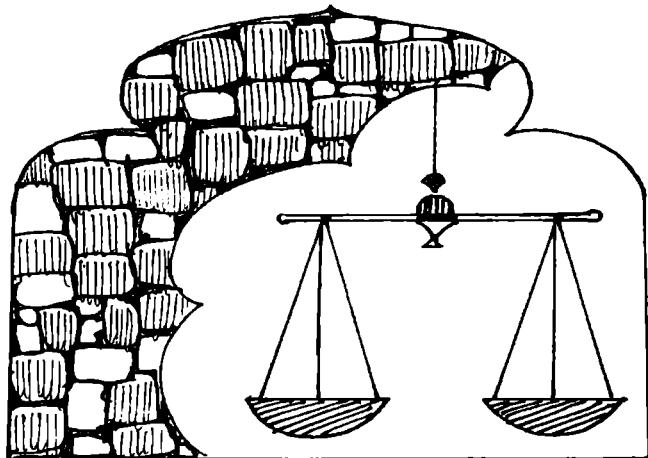
মক্কা বিজয়ের পরের এক ঘটনা। ঘটনার সাথে জড়িত ছিল এক মহিলা। 'বনি মাখদুম' নামে কুরাইশদের এক শাখা গোত্র ছিল। অতি সম্মানী গোত্র ছিল এটি। সেই গোত্রের এক মহিলা চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল। মাখদুম গোত্র অন্যদের বিচার সালিসী করে থাকে। অথচ তাদেরই একজন আজ অভিযুক্ত। এখন যে মহিলার হাতকাটা যাবার জোগাড়। ইসলামী আইনে এর কোনো ব্যতিক্রমও নেই।

নামকরা গোত্র। মানী-সম্মানী মহিলা। অথচ তার হাতকাটা গেলে লজ্জার শেষ থাকবে না। তাই গোত্রের লোকেরা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। তারা নবীজীকে বুঝিয়ে শাস্তি কম করার কৌশল নিয়ে ভাবল। তাই তারা এমন একজনকে ঠিক করল যার কথা নবী (সা) অবশ্যই শুনবেন, অগ্রাহ্য করবেন না।

শেষমেশ একজনকে ঠিক করা হলো। নাম তাঁর হযরত উসামা (রা)। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালিত পুত্র ক্রীতদাস জায়েদের সন্তান তিনি। উসামা (রা)-কে বড় ভালোবাসেন নবী মুহাম্মদ (সা)। মক্কা বিজয়ের দিন তাঁকে নিজ উটের পিঠে চড়িয়ে নবীজী মক্কা শহরে প্রবেশ করেন। গোত্রের লোকেরা ভাবল উসামার সুপারিশ মহানবী (সা) ফেলতে পারবেন না।

অবশেষে হযরত উসামা (রা) মহিলাকে নিয়ে নবী (সা)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। নবীজী উসামার আর্জি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বড় নম্র ও ভদ্রভাবে শুধালেন উসামা। তিনি মহিলাকে মাফ করার প্রস্তাব রাখলেন।

উসামার কথা শুনে মহানবী (সা) বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নবী (সা) উসামাকে বললেন, 'উসামা! তুমি আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে বলছ আমাকে?'

একথা শুনে লজ্জায় উসামার মুখ লাল হয়ে গেল। সে তাঁর অপরাধ বুঝতে পারল। তাই মাফ চাইল নবী (সা)-এর কাছে। মহানবী (সা) এবার বললেন, 'খোদার কসম, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি এ অন্যায় কাজে লিপ্ত হতো, তা হলে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি হতে সেও রেহাই পেত না।'

কতই না ন্যায়বান মানুষ ছিলেন আল্লাহর নবী (সা)। তাঁর ন্যায়বিচারের দায়িত্ববোধ ছিল কতই না খাঁটি!

ব ল তে পা রো ?

১. কোন গোত্রের মহিলা চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল?
২. মহিলাকে নিয়ে গোত্রের লোকেরা কী পরিকল্পনা করল?
৩. উসামা (রা) কে? তিনি কী করলেন?
৪. মহানবী (সা) উসামাকে কী বললেন?

ক্ষমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)

মহানবী (সা) ছিলেন ক্ষমার নবী। ক্ষমার মহিমা ছিল তাঁর চরিত্রের অনন্য ভূষণ। জীবনভর তিনি মানুষকে ক্ষমা করে গেছেন। তারপরও নবীজী গোটা জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। কাফেরদের বহু অত্যাচার তিনি নীরবে সয়ে গেছেন। তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করা হয়েছে। তাঁর ওপর পাথর মারা হয়েছে। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন। তারপরও সবকিছু তিনি ধৈর্য ধরে মেনে নিয়েছেন।

আল্লাহর নবী (সা) কাফেরদের শত অত্যাচার ও অপবাদের জবাবে কখনও পাল্টা কিছু করেননি। কাফেররা তাঁর গলায় ফাঁস লাগিয়েছে। অথচ তিনি তার প্রতিবাদ করেননি। তাদের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেননি। কাফেররা তাঁর মাথা ফাটিয়েছে, মেরে শরীর ঝাঁঝরা করেছে। তারপরও তিনি কাউকে কটু কথা বলেননি, বরং তাদের সবাইকে হাসিমুখে ক্ষমা করেছেন। ক্ষমার এমন অজস্র নজির রয়েছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনে।

বনু হানিফা গোত্রের এক ঘটনা। এই গোত্রের লোকেরা ছিল কুচক্রী ও ভয়ানক অপরাধী। নানান খারাপ কাজে এরা জড়িত ছিল। মন্দ কাজে

এদের জুড়ি ছিল না। এ গোত্রে ছিল ইসলামবিদ্বেষী এক খুনি সর্দার। নাম তার সুমামা ইবনুল আদাল। বহু খুনে তার হাত রঞ্জিত হয়েছিল। অসংখ্য মুসলমানের সর্বনাশ করেছিল এই সুমামা।
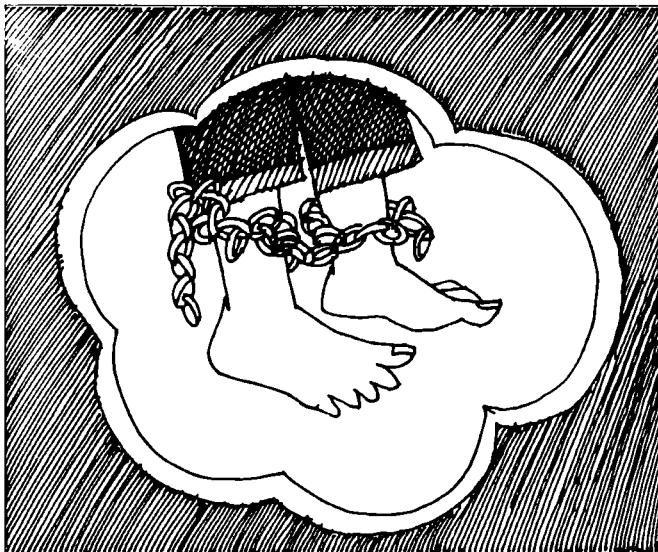
এক সময় সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। সবাই তাকে কতলের দাবি তুলল। সকলেই সুমামার মৃত্যুদণ্ড চাইল। কারণ সে ছিল ইসলামের বড় দুশমন। একদিন বন্দীকে হাজির করা হলো নবীজীর কাছে। তিনি বন্দীটির দিকে ভালোভাবে তাকালেন।

তারপর মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

বন্দীটি বলল, 'আমি একজন দুশমন, খুব বড় অপরাধী। আমার অপরাধের জন্য আমাকে হত্যা করতে পারেন। আর যদি মাফ করেন তা হলে আমি কৃতজ্ঞ হব। তা না করে মুক্তিপণ চাইলে বলুন, কত দিতে হবে?'

বন্দী সুমামার কথা শুনে মহানবী (সা) চুপ করে রইলেন। সেদিনের মতো কোনো কিছুই বললেন না তাকে, বরং নবীজী সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও সুমামাকে একই প্রশ্ন করলেন নবীজী। আর সুমামাও তাঁকে একই জবাব দিল। সুমামা এখন বুঝতে পারল মৃত্যুই হয়তো তার আসল পরিণতি। এর জন্য সে তৈরিও হয়ে গেল।

এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ নবীজী একজন সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি সুমামার বাঁধন খুলে তাকে মুক্ত করে দিতে বললেন। সাহাবী যা আদেশ পেলেন তাই পালন করলেন। মুক্তি পেয়ে সুমামা তো হতবাক। এই ক্ষমা যে তার কল্পনারও বাইরে!

সুমামার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না। মুক্তি পেয়ে সামনে এগিয়ে চলছে সুমামা। কিন্তু তার পা যেন আটকে যাচ্ছে বারবার। সুমামা ভাবল– এমন বড় মাপের মানুষকে ছেড়ে যাওয়া যায় না। মুহাম্মদ (সা) সত্যিই সেরা মানুষ। তাঁর পরশ পাওয়াও যে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই সুমামা একটা কূপ থেকে পানি তুলে গোসল সেরে পুনরায় ফিরে এলো। সে মহানবী (সা)-এর কাছে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। সুমামা নবীজীর নিকট ইসলামের দীক্ষা নিল। সহসাই সে সোনার মানুষে পরিণত হলো। মহানবী (সা) তাঁর ক্ষমার মহিমা দিয়ে একজন শত্রুকেও প্রকৃত মানুষে পরিণত করলেন।

বলতে পারো?

১. কাফেররা মহানবী (সা)-এর ওপর কী ধরনের অত্যাচার চালাল?
২. সুমামা ইবনুল আদাল কে? সে কেমন লোক ছিল?
৩. আল্লাহর নবী (সা)-এর কাছে সুমামা কী প্রস্তাব রেখেছিল?
৪. মহানবী (সা) সুমামাকে কী করলেন?
৫. অবশেষে সুমামার জীবনে কী ঘটল?

গরিবের প্রতি দরদি মহানবী (সা)

নবী মুহাম্মদ (সা) একদিন এক সভায় বসেছিলেন। সাহাবীদের সাথে নানান বিষয় নিয়ে আলোচনায় মগ্ন তিনি। এমন সময় দামি পোশাক পরে একজন লোক সভার সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। নবীজীর নজরে পড়ল সেই লোকটি। মহানবী (সা) তাকে আগে থেকে চিনতেন না। তাই তিনি সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন : 'লোকটি কে?'

এক সাহাবী জবাব দিলেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা)! তিনি একজন নামী-দামি লোক। বড় ধনী মানুষ। তাই লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। তার কথা সবাই শোনে। সবাই তাকে মান্যও করে।

নবীজী সাহাবীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। কিছু না বলে বরং আবার তিনি সভার কাজে মনোনিবেশ করলেন। খানিকক্ষণ পর অন্য একলোক একইভাবে সভাস্থলের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। লোকটি ছিল অতি

দীনহীন। তার পরনে ছিল ধূলিমলিন পোশাক। এই লোকটিও নবীজীর নজরে পড়ল। এবার নবীজী সাহাবীদের প্রশ্ন করলেন : 'কে এই লোকটি?'

সাহাবীরা জবাব দিলেন, 'তিনি তো একজন গরিব লোক। অতি সাধারণ মানুষ। কেউ তার সাথে সম্পর্ক করতে চায় না। তার কথা কেউ শোনে না। তাকে কেউ মান্যও করে না।'

সাহাবীদের কথা শুনে নবীজী মনে খুব ব্যথা পেলেন। গরিবের প্রতি মানুষের অনীহার কথা শুনে মহানবী (সা)-এর মন বিগলিত হয়ে গেল। তখন নবীজী সাহাবাদের বললেন,

'শোন সাহাবীরা! দুনিয়ার সব গরিব লোকই আমার নিকট অতি প্রিয়।'

গরিব দুঃখী মানুষের জন্য মহানবী (সা)-এর কী দরদমাখা বাণী! তিনি ছিলেন গরিবের সত্যিকারের বন্ধু, প্রকৃত দরদি।

ব ল তে পা রো ?

১. একদিন মহানবী (সা) কী করছিলেন?
২. দামি পোশাক পরা লোকটি সম্পর্কে সাহাবীরা কী মন্তব্য করেছিলেন?
৩. গরিব লোকটি সম্পর্কে সাহাবীরা কী মন্তব্য করেছিলেন?
৪. গরিবদের ব্যাপারে মহানবী (সা) কী বলেছিলেন?

মহান দাতা মহানবী (সা)

নবী মুহাম্মদ (সা) ছিলেন অতিশয় দানশীল। তাঁর কাছে কোনো অর্থ সম্পদই জমা থাকত না। তাঁর হাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে যা আসত তা তিনি সন্ধ্যার আগেই বিলিবণ্টন করে দিতেন।

মহানবী (সা) ছিলেন আরব জাহানের অধিপতি। অথচ দরকারের বেশি কোনো কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। তিনি এমন জিনিস ব্যবহার করতেন যা সহজে পাওয়া যেত এবং যে জিনিস দামেও সস্তা। তিনি জব ও খেজুর খেয়ে তুষ্ট থাকতেন। কেউ কিছু চাইলে তিনি তা অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। নবীজীর কাছে কিছু চেয়ে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফেরত যেত না।
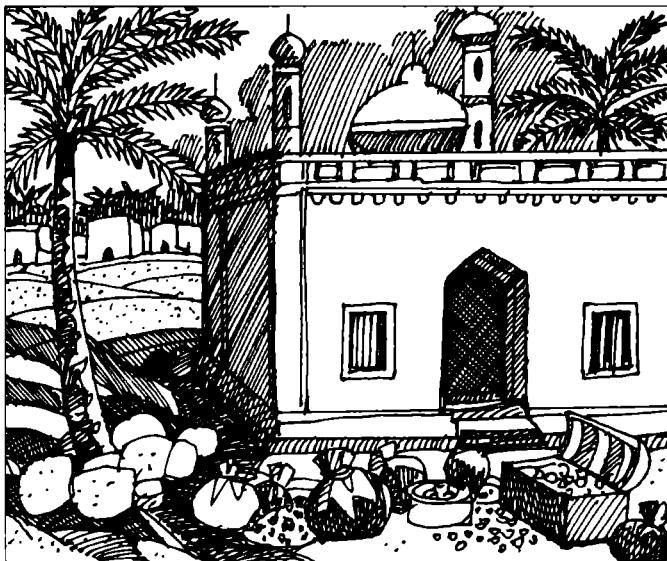
একবার বাহরাইন প্রদেশ থেকে প্রচুর অর্থ রাজস্ব হিসেবে এসে জমা হলো। এগুলো সবই নবীজীর কাছে নিয়ে আসা হলো।

নবীজী জিনিসগুলো মসজিদের সামনে রাখার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি নামায আদায় করলেন। নামায সেরে এসেই তিনি টাকা পয়সা ও অর্থ সম্পদ গরিবের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। সেদিন সবাই প্রচুর অর্থ পেল। তাই সবাই খুব খুশি হলো। টাকা পয়সা বিলিয়ে দেয়ার পর নবীজীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন।

আরেক দিনের ঘটনা। এক সাহাবীর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর ওয়ালিমার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সাহাবীর ঘরে খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই সাহাবী ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি গেলেন নবীজীর কাছে। তাঁকে সব কথা খুলে বললেন। মহানবী (সা) তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। নবীজী তাকে বলে দিলেন, 'তুমি যাও বাড়িতে। বিবি আয়েশার কাছে যাও। তাঁকে আমার কথা গিয়ে বলবে। আর বলবে– তোমাকে কিছু খাবার জিনিস দিতে।'

সাহাবী নবী (সা)-এর কথামত তাই করলেন। তিনি বিবি আয়েশার কাছে গেলেন। নবীজী যা বলেছেন তাই তাকে জানালেন সাহাবী। সাহাবীর কথা শুনে স্ত্রী আয়েশা (রা) এক বস্তা ছাতু বের করে সাহাবীকে দিয়ে দিলেন। জিনিসগুলো পেয়ে সাহাবী অত্যন্ত খুশি হলেন এবং সেটা নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন। এই ছাতু দিয়েই তার বিয়ের ওয়ালিমার খাবার সম্পন্ন করলেন।

অথচ নবীজীর ঘরে সে রাতে আর কোনো খাবার ছিল না। সব খাবার দান করে দিয়ে তিনি নিজেই নিঃস্ব হয়ে গেলেন।

ব ল তে পা রো ?

১. মহানবী (সা) কেমন জিনিস ব্যবহার করতেন?
২. বাহরাইন থেকে আসা রাজস্ব মহানবী (সা) কিভাবে বিতরণ করলেন?
৩. এক সাহাবীর ওয়ালিমার খরচ কিভাবে যোগাড় হলো?
৪. সেদিন মহানবী (সা)-এর ঘরের কী দশা হয়েছিল?

মহানবী (সা)-এর সুন্দর ব্যবহার

আমাদের প্রিয়নবী (সা) ছিলেন সেরা আদর্শের নমুনা। তিনি জীবনে কারও সাথে রাগ করেননি। তিনি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। হোক সে মুসলমান, বিধর্মি কিংবা অমুসলিম। তিনি কাউকে কোনো কটু কথা বলতেন না। তাঁর সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলেও না। নবীজীর ভালো ব্যবহার, ভালোবাসা ও উদারতা দেখে মানুষ দলে দলে ইসলাম কবুল করেছিল।

এক ইহুদির সাথে এক ঘটনা। মহানবী (সা)-এর সাথে তার কিছু লেনদেন ছিল। পাওনা শোধ করার তারিখও ঠিকঠাক ছিল। দেনা পরিশোধের দিন তারিখ তখনও আসেনি। অথচ আগেভাগেই ইহুদি লোকটি নবীজীর কাছে এসে তার পাওনা চেয়ে বসল। অযথা তাঁকে তাগাদা দিতে লাগল। সেই সাথে মন্দ কথাও বলতে লাগল। নবীজী তাকে নম্রভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইহুদি লোকটি কিছুই বুঝতে চাইল না। নবীজীর কোনো কথাই সে শুনতে চাইল না।

মহানবী (সা) ইহুদির আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তবে তিনি মোটেও ধৈর্যহারা হলেন না। ইহুদি যত উত্তেজিত হচ্ছিল নবীজী ততই শান্ত থাকলেন। ইহুদির খারাপ আচরণ দেখে হযরত উমর (রা) স্থির থাকতে পারলেন না। এতে নবীজী উমর (রা)-এর ওপর খুশি হলেন না।

তিনি হযরত উমরকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখ উমর! সে পাওনাদার। সে তার পাওনার জন্য তাগাদা দিচ্ছে। এতে তার কোনো দোষ নেই। তুমি তাকে পারতো উপদেশ দাও। নম্রভাবে কথা বলো, রাগ করে নয়।'

নবীজীর এই সুন্দর উপদেশগুলো ইহুদি মন দিয়ে শুনছিল। নবী (সা)-এর কথায় সে অবাক হলো। এত ভালো মানুষ তিনি! এত সুন্দর কথা বলেন! এত ভালো ব্যবহার তাঁর! ইহুদি এতে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। এবার সে শান্ত হলো এবং লজ্জা পেল।

তারপর ইহুদি লোকটি আর থেমে থাকতে পারল না। তার বুক ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হলো। এবার সে মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বলে বিশ্বাস করে নিলো। মহানবী (সা)-এর সুন্দর ব্যবহারে ইসলামের বিজয় হলো।

বলতে পারো?

১. এক ইহুদি মহানবী (সা)-এর কাছে কেন এসেছিল?

২. ইহুদির ব্যবহার কেমন ছিল?

৩. উমর (রা)-কে মহানবী (সা) কী বলেছিলেন?

৪. অবশেষে ইহুদি লোকটি কেন মুগ্ধ হলো?

নিঃস্বার্থ মানুষ মহানবী (সা)

নবীজী নিজেকে নিয়ে ভাবতেন না। তাঁর নিজের সুখ ও স্বার্থ নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তা ছিল না। পরের জন্য তিনি তাঁর যত সুখ ও স্বার্থ ভুলে যেতেন।

জীবনে অভাবে অনটনে তিনি বহু কষ্ট করেছেন। না খেয়ে থেকেছেন। কখনও কখনও তাঁর নিকট অজস্র সম্পদ এসেছে। অথচ তা তিনি গ্রহণ করেননি, বরং সব বিলিয়ে দিয়েই সুখী হয়েছেন। এমনকি প্রাণের চেয়ে প্রিয় কন্যা ফাতেমার সুখের কথাও তিনি ভাবেননি।
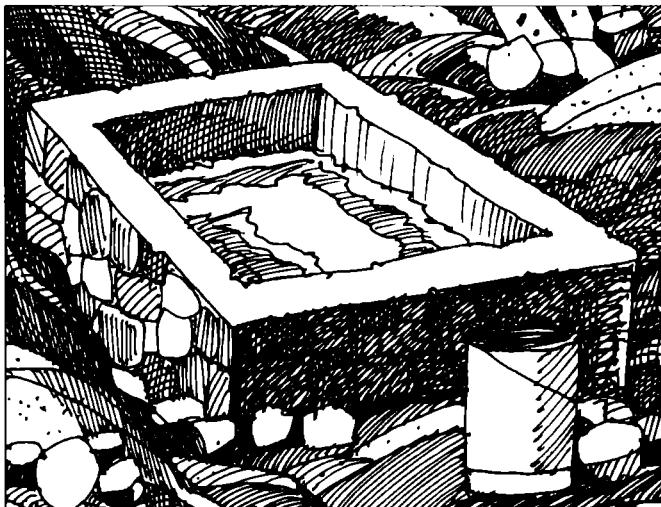
হযরত আলী (রা)-এর সাথে ফাতেমার বিয়ে হলো। হযরত আলী (রা)-এর অবস্থা মোটেও সচ্ছল ছিল না। সংসারে টানাটানি ও অভাব-অনটন লেগেই থাকত। তাই ফাতেমার সংসারে কোনো দাসদাসী ছিল না। হযরত ফাতেমাকে নিজ হাতেই সংসারের কাজ করতে হতো। গম পেষা, পানি তোলা, বাসন মাজাসহ সংসারের যাবতীয় কাজ ফাতেমা (রা) নিজের হাতে করতেন। ফলে রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজ করে তিনি প্রায়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন।

একবার এক যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হলো। বহু মালামাল মুসলমানদের হাতে এলো। অনেক বন্দী দাসীও এলো। হযরত আলী (রা) তাই নবীজীকে অনুরোধ করলেন একজন দাসীর জন্য। তিনি রাসূল (সা)-কে বিনীতভাবে বললেন, 'ফাতেমার কাজ করতে খুব কষ্ট হয়। তাই তার জন্য একজন দাসী হলে ভালো হয়।'

মহানবী (সা) তাঁর জামাতা হযরত আলী (রা)-এর কথা শুনলেন বটে। কিন্তু তার কথায় সায় দিলেন না।

মহানবী (সা) বললেন : 'না, এটা হয় না। আগে অন্যদের অভাব পূরণ হোক। তারপর যদি উদ্বৃত্ত থাকে তা হলে তোমার কথা ভাবা যেতে পারে।'

নবীজীর কথা শুনে আলী (রা) ভীষণ লজ্জা পেলেন। তিনি আর না করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত কোনো দাসীও পাওয়া গেল না।

কত নিঃস্বার্থ ছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)! সুযোগ পেয়েও নিজ ও নিজের পরিবারের স্বার্থের কথা ভাবেননি তিনি।

■ ব ল তে পা রো ?

১. হযরত আলী (রা)-এর আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?

২. হযরত ফাতেমা (রা)-এর সংসারের কাজ কে করত?

৩. মহানবী (সা)-এর কাছে দাসী চাইলে তিনি আলী (রা)-কে কী বলে ফিরিয়ে দিলেন?

নবীর শিক্ষা ভিক্ষা করো না

মহানবী (সা) কাজকেই সবসময় পছন্দ করতেন। ভিক্ষাবৃত্তি তাঁর কাছে ছিল ঘৃণার বিষয়। একবার এক অভাবী লোক এলো নবীজীর নিকট। লোকটি নবীজীকে বিনীতভাবে বলল, 'আমি খুব গরিব। ভিক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমার।'

নবীজী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার কি কিছুই নেই?'

লোকটি বলল, 'না, নবীজী তেমন কিছু নেই। আমার বাড়িতে একটি কুঠার আছে মাত্র। কুঠারের বাঁট লাগানো নেই।'

মুহাম্মদ (সা) লোকটিকে তার কুঠারটি তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মহানবীর (সা)-এর কথা শুনে লোকটি বাড়িতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে বাঁটহীন কুঠার নিয়ে নবীজীর নিকট এসে হাজির হলো। নবীজী

কুঠারটি হাতে তুলে নিলেন। তিনি নিজের হাতে কুঠারে হাতল লাগালেন। তারপর লোকটিকে বললেন, 'এই নাও কুঠার। এটা নিয়ে চলে যাও। বন থেকে কাঠ কেটে এনে তা বাজারে বিক্রি করো। চিন্তা করবে না। আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।'

লোকটি আর কিছুই বলল না। সে কুঠার নিয়ে চলে গেল। নবীজীর কথামত সে বনে গিয়ে কাঠ কাটল। সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করতে লাগল। কিছুদিন যেতে না যেতেই লোকটির বেশ উন্নতি হলো। সে আর গরিব রইল না। নবীজীর কথায় ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে লোকটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলো।

বলতে পারো ?

১. মহানবী (সা) কোন কাজ অপছন্দ করতেন?
২. একবার এক অভাবী লোক মহানবী (সা)-এর কাছে কী চাইল?
৩. অভাবী লোকটিকে নবী (সা) কী আনতে বললেন?
৪. মহানবী (সা) কুঠার দিয়ে কী করলেন?
৫. অভাবী লোকটি কিভাবে অভাব থেকে নিষ্কৃতি পেল?

দরদি নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)

মহানবী (সা)-এর মন ছিল সীমাহীন দরদে ভরা। কারও দুঃখ দেখলে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর মনে কষ্ট হতো। তাই দুঃখী ও অসুখী মানুষের কষ্ট লাঘব করতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন।

একবার ঘটল এক ঘটনা। এক বালক খিদের জ্বালায় আর চলতে পারছিল না। অগত্যা বালকটি ঢুকে পড়ল এক ফলের বাগানে। বাগানটি ছিল সুমিষ্ট ফলে ভরপুর। বালকটি পেটের ক্ষুধা মেটানোর জন্য বাগান থেকে কিছু ফল কুড়িয়ে নিল। সেই ফল সে পেট ভর্তি করে খেল। পরে প্রয়োজন পড়লে যাতে খেতে পারে তার জন্য কিছু ফল পকেটেও পুরে নিল। এরপর গাছের নিচে বসে বালকটি বিশ্রাম নিচ্ছিল।

এমন সময় বাগানের মালিক সেখানে গিয়ে হাজির হলো। বালকের পকেটে ফল দেখতে পেয়ে মালিক রেগেমেগে আগুন হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হয়ে সে বালকটিকে বেদম প্রহার করল। পকেটের ফলগুলোও বালকটির

কাছ থেকে কেড়ে নিল। শুধু তাই নয়, বাগানের মালিক বালকটির পরনের কাপড় চোপড় কেড়ে নিয়ে গেল।

নিরুপায় হয়ে বালকটি মহানবী (সা)-এর নিকট এসে নালিশ করল। সে কেঁদে কেঁদে জানাল : 'হযরত! আমি তিন দিন ধরে উপোস ছিলাম। কেউ আমাকে এক মুঠো খাবারও দেয়নি। খিদের জ্বালায় অস্থির হয়ে এক বাগানে ঢুকেছি এবং কষ্ট সইতে না পেরে বাগানের মালিককে না বলে ফল খেয়েছি। ফলগুলো গাছের তলায় পড়েছিল। পরে খাবারের জন্য কিছু ফল পকেটে ভরে রেখেছিলাম। কিন্তু এক সময় আমি বাগানের মালিকের হাতে ধরা পড়ি। এ জন্য বাগানের মালিক আমাকে অনেক মেরেছে। আমি এতে হুঁশ হারিয়ে ফেলি। হুঁশ ফিরে এলে দেখতে পেলাম আমার পরনে কাপড় নেই। বাগানের মালিক আমার কাপড় চোপড়ও কেড়ে নিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে বিচার চাচ্ছি।'

মহানবী (সা) বালকটির দুঃখের কথা মন দিয়ে শোনলেন। বালকটির কথা শুনে নবী (সা) মর্মাহত হলেন। তাই তিনি বাগানের মালিককে ডেকে পাঠালেন। নবীজীর কথা শুনে বাগানের মালিক নবীজীর সামনে এসে হাজির হলো।

মহানবী (সা) বললেন : 'সে খুবই ছোট্ট এক বালক। ক্ষুধার জ্বালায় পড়ে সে তোমার বাগানে ঢুকেছে। কয়েকটা ফল খেয়েছে। এতে কিইবা দোষ হয়েছে? সে তো বিপদে পড়েই এ কাজ করেছে। আর আল্লাহ তো বাগানে প্রচুর ফল দান করেছেন। তুমি কি বালকটিকে মাফ করতে পারতে না?'

মহানবী (সা)-এর কথা শুনে বাগানের মালিক খুব লজ্জা পেল। সে বুঝতে পারল, আসলেই সে কাজটি ঠিক করেনি। এটা তার অন্যায় হয়েছে। তাই সে মাফ চাইল এবং বালকটির কাপড় চোপড় ফেরত দিল।

শুধু তাই নয়। বাগানের মালিক বালকটিকে তার বাড়িতে নিয়ে আশ্রয় দিল। মহানবী (সা)-এর দরদপূর্ণ মনের কারণে বালকটি মাথা গোঁজার একটি আশ্রয় পেল।

বলতে পারো ?

১. একবার এক ক্ষুধার্ত বালক কী করেছিল?
২. বাগানের মালিক বালকটির সাথে কী ব্যবহার করল?
৩. অসহায় বালকটি নিরুপায় হয়ে কী করল?
৪. মহানবী (সা) বাগানের মালিককে কি বললেন?
৫. অবশেষে বাগান মালিক বালকটির জন্য কী করল?

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টির কথা ছাড়া নবীজী কোনো কিছুই ভাবতে পারতেন না। আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য তিনি অন্যদেরও প্রেরণা জোগাতেন।

একদিনকার এক ঘটনা। মহানবী (সা) ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় বাড়িতে এলো এক ক্লান্ত পথিক। নবীজীর দরজায় এসে দাঁড়াল সে। যেন কদিন ধরে খেতে পায়নি সে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় লোকটার দেহ যেন আর চলছিল না। পথিক এসেই নবীজীর কাছে বিনীতভাবে বলল, 'কিছু খাবার চাই। পেটের ক্ষুধা যে আর সইতে পারছি না।'

লোকটার অবস্থা দেখে নবীজী খুব দুঃখ পেলেন। তখনই তিনি তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলেন। নবীজী লোকটাকে তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। কিন্তু সেদিন ঘরে পানি ছাড়া আর কোনো খাবার ছিল না। এ কথা শুনে লোকটা ফিরে এলো মহানবী (সা)-এর কাছে। নবীজী এবার তাকে তাঁর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। কিন্তু সেখানেও ছিল একই অবস্থা। সেই ঘরেও কোনো খাবার ছিল না।

লোকটি হতাশ হয়ে আবার ফিরে এলো মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে। নবী (সা) আর কী করবেন! ভেবেচিন্তে কোনো কূল-কিনারা পেলেন না। তবে লোকটার ক্ষুধা মেটানোর জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এক সাহাবী। তিনি ছিলেন একজন আনসার। নাম তার হযরত তালহা (রা)। সেই আনসার নবীজীর পেরেশানি দেখে অস্বস্তিবোধ করলেন এবং বিচলিত হলেন। নবী (সা)-এর মনের অবস্থা তাকে খুব কষ্ট দিল।

তাই তালহা (রা) মহানবী (সা)-কে বিনীতভাবে বললেন : 'আপনি অত পেরেশান হচ্ছেন কেন? আমি তো আছি হুজুর। আমাকে হুকুম করুন। আমি লোকটার খাবারের ব্যবস্থা করি। এতে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করব।'

একথা শুনে মহানবী (সা) কিছুটা স্বস্তি পেলেন। লোকটার খাবারের ব্যবস্থা হওয়ায় তিনি হযরত তালহার প্রতি খুশি হলেন। তাঁর দু'ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল। নবীজী তালহা (রা)-এর জন্য প্রাণভরে দোয়া করলেন।

আনসার তালহা (রা) মেহমানকে নিয়ে বাড়ি এলেন। অতিথির বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। তিনি স্ত্রীকে সব কথা খুলে বললেন এবং লোকটার খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। স্বামীর কথা শুনে কেঁপে উঠল তার স্ত্রী। তিনি জানালেন : 'ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে সামান্য খাবার আছে। তা ছাড়া আর কিছুই নেই।' আনসার জানালেন : 'যে করেই হোক লোকটাকে খাওয়াতে

হবে।' তালহা (রা)-এর স্ত্রী বললেন : 'ছেলেমেয়েদের খাবারগুলোই না হয় লোকটাকে দেব। ওদের কিছু একটা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু আপনার কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী মেহমানের সাথে আপনাকেও তো খেতে বসতে হবে। আর যা খাবার আছে তা দিয়ে দু'জনের পেট পুরবে না।'

এবার আনসার বললেন : 'ব্যাপারটা তুমি ঠিকই বলেছ। তা হলে এখন উপায়?' স্ত্রী খানিকটা ভাবলেন। তারপর বললেন : 'একটা কাজ করা যায়। যখন আপনারা খেতে বসবেন তখন কৌশলে আমি বাতিটা নিভিয়ে দেব। আপনি খাবারের ভান করবেন। কিন্তু খাবেন না। তা হলে যা খাবার আছে তা মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে।' স্ত্রীর কৌশলটা তালহা (রা)-এর খুব পছন্দ হলো। ঠিক হলো এভাবেই সব কাজ করা হবে।

হযরত তালহা (রা) মেহমানকে নিয়ে খেতে বসলেন। তাদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। খাবারের শুরুতেই আনসারের স্ত্রী ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলেন। আনসার অন্ধকারে না খেয়েই খাবারের ভান করলেন। ওদিকে মেহমান অন্ধকারে বসে পেট ভর্তি করে খেয়ে নিল। মেহমান আনসারের কৌশল কিছুতেই বুঝতে পারল না। এদিকে স্ত্রী পুত্র পরিজন নিয়ে আনসার তালহা (রা) সারারাত উপোস কাটালেন।

পরদিন আনসার গেলেন নবীজীর নিকট। তিনি নবী (সা)-কে সব ঘটনা খুলে বললেন। তালহার বিবরণ শুনে নবী মুহাম্মদ (সা) যারপরনাই খুশি হলেন। তিনি আনসার তালহা (রা)-এর জন্য দোয়া করলেন। নবী (সা) জানালেন : আনসারের এ কাজের জন্য আল্লাহতাআলা সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বলতে পারো ?

১. একদিন মহানবী (সা)-এর কাছে কে এলো?
২. নবী (সা)-এর ঘরে খাবার না পেয়ে পথিক কী করল?
৩. হযরত তালহা (রা) কী করলেন?
৪. হযরত তালহা (রা)-এর স্ত্রী কিভাবে লোকটিকে খাওয়ালেন?
৫. পথিককে খাওয়ানোর পর তালহা (রা)-এর পরিবারের অবস্থা কী হয়েছিল?
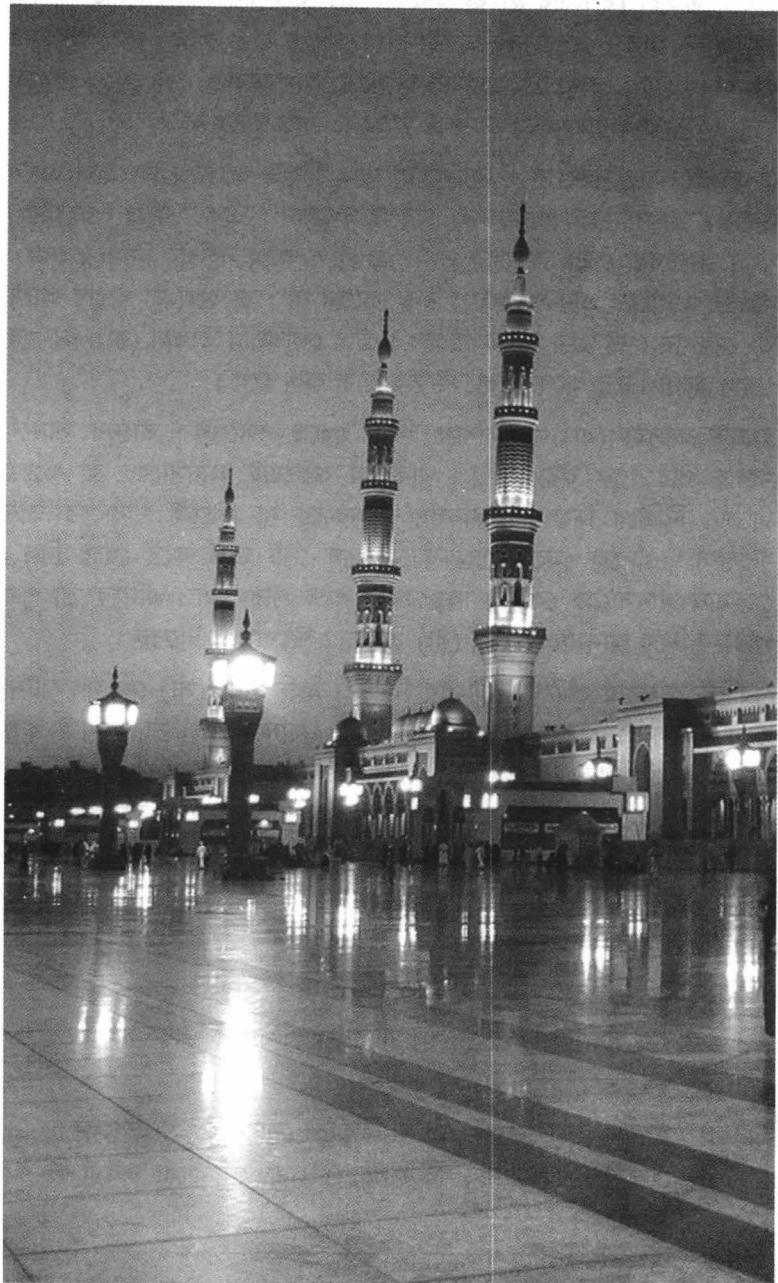
শিশু কানন
৩০৭ পশ্চিম রামপুরা, উলন রোড, ঢাকা

I SBN 984839400- 1
9 789848 394007